যত্র জীব তত্র শিব

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ- অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১২ই ফেব্রয়ারী, ২০১০ ২৯শে মাঘ, ১৪১৬

মুদ্রণ--মেসার্স এম. দত্ত ১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in

Website : www.avinabadarshan.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬
৩) ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। অধ্যাত্মচেতনার পুণ্যভুমি এই ভাতরবর্ষ। যুগ যুগ ধরে এই ভারতবর্ষের মঠে মন্দিরে বিভিন্ন দেবদেবতারা পূজিত হয়ে আসছেন। আবার এই সকল দেবদেবতার মধ্যে মহাদেব বা শিবের আরাধনা হয় সবচেয়ে বেশী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। ধনী দরিদ্র-উচ্চনীচ নির্বিশেষে সবার মাঝে তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি অল্পতেই তুষ্ট হন। যেখানে অন্যান্য দেবদেবতাদের বসন-ভূষণ, আহার-বিহারে আড়ম্বর দেখা যায়, সেখানে তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। তিনি এমন ফুলফল গ্রহণ করতেন, যেটা অন্যান্য দেবদেবতা কেন, সাধারণ মানুষও অনেক সময় গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করে।

শিব মঙ্গলের প্রতীক। তিনি এই পৃথিবীরই সন্তান। তিনি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন। হিমালয় পর্বতেই তিনি বাস করতেন। হিমালয় পর্বতের বিশালত্ব তাঁকে অভিভূত করেছিল। হিমালয় পর্বত শুভ্র; তিনিও শুভ্র। হিমালয় পর্বতের মতো ধীর স্থির অচল অটল হয়ে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। শিশুবয়স থেকেই তিনি প্রকৃতির তত্ত্বে মহাশূন্যের তত্ত্বে বিভোর হয়ে থাকতেন। ঐ বয়সেই তিনি ছিলেন অষ্টসিদ্ধ।

পরম মঙ্গলময় শিব ছিলেন কর্মের পূজারী। তিনি সাধারণ মানুষদের নিয়ে, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে, চাষ-আবাদের উপযুক্ত করে, চাষবাস করতেন। তিনি সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত শ্রেণীর লোকেদের বাঁচাবার জন্য, তাদের ন্যায্যদাবী আদায়ের জন্য, তাদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন। তিনি ঘূণ ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে, নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু মানুষের জন্য নয়, সমস্ত জীবজাতির সুখ দুঃখকে, তিনি নিজের সুখ দুঃখ বলে মনে করতেন। তাই তিনি দেবাদিদের মহাদেব। সমস্ত মানবজাতিকে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

তাঁর কাছে সমাজ ও দেশের মঙ্গল সাধনই একমাত্র বড় কাজ ছিল না। সর্বজীবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি এবং সমস্ত মানুষের আত্মিক উন্নতির পথও তিনি প্রশস্ত করে দেন। আজ আমরা যে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা, বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বলি, এসবেরই তিনি পথ প্রদর্শক। তিনিই প্রথম সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব হয়েও, সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য, সকলের সাথে হাত মিলিয়ে, তিনি কাজ করতেন। সমাজে শ্রেণীভেদ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে, এক অখণ্ড সমাজ গড়ে, তিনি সমাজকে এক সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন।

পরম প্রেমময় শিবের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সাধারণ। যেখানে মঠে মন্দিরে অন্যান্য দেবদেবীদের আসন সিংহাসনে, সেখানে শিবের আসন শ্মশানে। তিনি শ্মশানে বাস করতেন সাধনা বা মুক্তির জন্য নয়। তিনি বুঝেছিলেন, শ্মশানই হ'ল সবার আসন। এখানে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, হিংসা, মারামারি নাই; রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, কাঙাল সবার জন্য সমান আসন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, আমরা সবাই শ্মশানের চুল্লীতেই বসে আছি। তাই চুল্লী বা গোরস্থান যখন শেষ কথা, তবে কেন সাময়িক আসনের লোভে এত ছল চাতুরী, কৌশল, হিংসা-দ্বেষ আর মিথ্যা, প্রবঞ্চনা? শ্মশান শুধু একটি স্থানেই সীমাবদ্ধ নয়। জীব যেখানে বাস করে, সেই ক্ষেত্রই শ্মশান। তাই শ্মশানকেই তিনি মানচিত্ররূপে বেছে নিয়ে, শ্মশানে তাঁর আসন স্থাপন করেছিলেন।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ পরম করুণাময় শিবের কর্মময় জীবনকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। ঘরোয়ানা পরিবেশে ভক্তও শিষ্যমণ্ডলীর সামনে এবং বিভিন্ন সময় শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে শিবের মহিমা ও কর্মময় জীবন সম্পর্কে তিনি বহু মনোজ্ঞ তত্ত্ব আলোচনা করেছেন এবং শিব যে বেদের তত্ত্ব নিয়ে থাকতেন, সেই অমৃতময় বেদতত্ত্বও পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো সেই সব অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন প্রকাশনে'র** উপর তিনি অর্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মার্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে 'অভিনব দর্শন প্রকাশনে'র ২৯-তম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো, **'যত্র জীব তত্র শিব।'**

পরিশেষে জানাই, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

২৯শে মাঘ, ১৪১৬ — *চপল মিত্র*

ইং ১২ই ফেব্রয়ারী, ২০১০ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

শ্মশানটা পৃথিবী নয়, পৃথিবীটা শ্মশান নয়। জীব যেখানে বাস করে, সেই ক্ষেত্রই শ্মশান

সুখচরধাম
৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৭

শিব হচ্ছেন মঙ্গল। মঙ্গলের পথিক হিসাবে তাঁকে মঙ্গলময় বলা হয়। মঙ্গলের প্রতীক শিব। তিনি এই পৃথিবীরই সন্তান। হিমালয় পর্বতেই তিনি বাস করতেন। শিশু বয়স থেকে এই বিশাল পর্বতের বিশালত্ব দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। এই হিমালয় পর্বত অচল, অটল, ধীর স্থির হয়েও এক জীবন্ত অবস্থায় বিরাজ করে, এক মহাশক্তির পরিচয় যেন দিচ্ছে। **হিমালয় একাধারে অচল, অটল। তার ভিতরে আবার প্রাণের সাড়া। সে মাটি আর পাথরে গড়া। গাছ গাছড়ায় ভরা। পাথরের থেকে এসেছে অবিরাম জলস্রোত। কোন চঞ্চলতা, বিক্ষিপ্ততা নাই। নাই কোন মান অভিমান।** আকাশপানে মাথা উঁচু করে সবাইকে আহ্বান করছে, 'তোমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াও, অচল অটল হয়ে। তাতে খুঁজে পাবে প্রাণের সাড়া, অন্তরের সাড়া। খুঁজে পাবে তোমার সাড়া, আমার সাড়া, নিজের সাড়া।' পৃথিবীর বুকে, মহান আকাশের দিকে মহান হয়ে, আজও সে তার নিজের সাধনায় ব্যস্ত।

হিমালয় পর্বতকে জিজ্ঞাসা করে এমনি কোন উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়ে যাচ্ছেন। নিজে তাঁর সর্বাঙ্গে যেন উত্তর দান করে যাচ্ছেন। তিনি নিজেই প্রশ্ন, নিজেই উত্তর। তাই

আমাদের উত্তরে (উত্তর দিকে) উত্তর হয়ে তিনি আজও তাঁর আসনে বসে তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন। সেই হিমালয়ই যেন শিবরূপে একরূপ নিয়ে বার হলেন। সেই একই রূপ; অচল, অটল, ধীর স্থির এক মঙ্গলের প্রতীক। মঙ্গলময় হয়ে তিনি হলেন আমাদের শিব। সেই হিমালয়েরই একটি প্রতিমূর্ত্তি, শিবের মূর্ত্তি, আজ আমরা যাকে শিবলিঙ্গ করে পূজা করছি। হিমালয়ের সেই কঠিন পাথর, নেমে এল শিলারূপে পাষান হয়ে। হিমালয় নিজেই যেন শিবলিঙ্গ হয়ে সবার দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। হিমালয়ের গাত্র বরফে আবৃত। তাই তাঁর অঙ্গ হল শুভ্র। সর্বাঙ্গে নিজেকে বরফে আবৃত করে, নিজের রূপকে আড়াল করে রেখেছেন। শিবের রঙও হল শুভ্র। তিনি বরফ না মেখে অঙ্গে মাখলেন ছাই।

এই হিমালয় শুভ্র। শিবও হলেন শুভ্র। হিমালয় থেকে অবিরাম ঝরণা ধারা বয়ে যাচ্ছে। শিবের জটা থেকে যেমন গঙ্গা এলেন, হিমালয়ের থেকেও নদনদীর সৃষ্টি হ'ল। **শিব শিশুবয়স থেকেই মহাশূন্যের তত্ত্ববিজ্ঞানে যুক্ত। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রের সাথে যোগাযোগ রেখে, সেইভাবে তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতির ধারায় কাজ করতেন। শিশুবয়স থেকেই তিনি অসীম শক্তির মালিক হয়েছিলেন।** তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করলেন; অন্যায় দমন করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করলেন সমাজে। শিব আমাদের মত মানুষ ছিলেন একদিন। সেই মানুষে ছিল বিরাট হুঁশ। তিনি নিজেকে দেবতা বা ভগবান বলতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, ''আমি সাধারণ কর্মী। অসাধারণকে সাধারণ করে দেওয়াই আমার কাজ। অসম্ভবকে সম্ভব করাই আমার কাজ।'' তিনি সমাজকে সুশৃঙ্খলায় আনলেন। সবাইকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন কিভাবে সমাজকে মুক্ত করা যায়। জানিয়ে দিয়ে গেলেন প্রেম ভালবাসা। শিবের আসন শ্মশানের আসন। তিনি শ্মশানে কেন বসলেন?

শিব শ্মশানে বসলেন সাধনা বা মুক্তির জন্য নয়। শ্মশান হ'ল সবার আসন। এখানে হিংসা নাই। রাজা-প্রজা, ধনী-কাঙাল সবার সমান কদর, সমান আসন। এখানে নাই বাদ-বিবাদ। সবাইকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই শিব শ্মশানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, ''শ্মশানের

আসনে কোনও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নাই; বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। তোমরা যে যেখানে ঘর বেঁধেছ, যে যেখানে মালিক, জমিদার হয়ে বসে আছ, মনে রেখ, ওটা গোরস্থান, শ্মশান। শ্মশানের চুল্লীতেই সর্বত্র বসে আছ। তাই চুল্লীতে যখন উঠবেই, শেষ হবে, তখন কেন সাময়িক আসনের লোভে বিবাদ, মারামারি, হিংসা দ্বেষ? তাই আমার ধ্যান-ধারণা, সাধনার জন্য নয়, তোমাদের জানাবার জন্য, বোঝাবার জন্য বেছে নিয়েছি সেই শ্মশানের মানচিত্রকে। শ্মশান শুধু এক একটি স্থানেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্ব পৃথিবীতেই এই মানচিত্রের ইঙ্গিত। এই একটা অঙ্গই (নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থান) শুধু শ্মশান নয়। তোমাদের অঙ্গের যেকোন জায়গার আঘাতে যেমন ব্যথা লাগে, ঠিক তেমনই পৃথিবীর সর্ব অঙ্গই শ্মশানময়, শ্মশানে গাঁথা ভুলে যেও না। ভুল করো না। পায়ের আঙুল থেকে মাথাটাকে সরিয়ে রাখলে মাথা সরানো হয় না। পায়ের আঙুলে ব্যথা দিলে ব্যথা লাগবে। তাই ব্যথা যা লাগার, তা তুমি নিজে পাচ্ছ। কোন অঙ্গই নিজে ব্যথা পায় না, পাও তুমি নিজে।''

শ্মশানটা পৃথিবী নয়। পৃথিবীটা শ্মশান নয়। তুমি যেখানে থাকবে, সেটুকুই শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। জীব পৃথিবীতে বাস করছে। জীব যেখানে বাস করবে, সেই ক্ষেত্রই শ্মশান। বৃহৎ অট্টালিকায় যদি বসে থাক, সেই প্রাসাদটিও তোমার জন্য শ্মশান। শিব বলছেন, তাই আমি শবদেহ একজায়গায় নিয়ে বাস করছি। যেই স্থানে (শ্মশানে) আসন বসিয়েছি মানচিত্রস্বরূপ, সেই জায়গাটুকুতে কোন হিংসা, বিবাদ নেই। শ্মশানে এলে অনেকের মনেই উদারতা, বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। মনের এই উদারতা, ব্যাপকতা সীমাবদ্ধ সাময়িক শ্মশান-বৈরাগ্যেই যেন শেষ না হয়। এই অবস্থা, মনের বৈরাগ্য শ্মশানেই শেষ করে এস না। এই বৈরাগ্য, এই উদারতা, এই আত্মোৎসর্গ সর্ব অবস্থার জন্য রেখ। বৈরাগ্যের জন্যই বৈরাগী বৈরাগ্য লাভ করলেন। তুমি সর্ব অবস্থায় বৈরাগী। কারণ তুমি শ্মশানের পথিক, যাত্রিক।

শিব বলছেন, তাই শ্মশানের ছাই অঙ্গে মেখে তোমাদের জানাচ্ছি, এই অঙ্গ একদিন ছাইয়ে পরিণত হবে। আমার অঙ্গে মেখে মানচিত্রস্বরূপ

জানিয়ে দিচ্ছি, এই অঙ্গের ফল হলো, পরিণতি হলো, ছাই। এই ছাই তিলকস্বরূপ ব্যবহার করছি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসি বলে, তাদের ওয়াকিবহাল করবার জন্য বলছি, তোমরা সাবধান হও। অঙ্গ দিন দিন ছাইয়ে পরিণত হয়ে আসছে। মাটিতে মেশার জন্য তৈরী হয়ে থাকো। করো না মান, অভিমান। অহঙ্কার করো না। পৃথিবীর ধর্মশালায় যখন এসেছ, সবাই একত্র হয়ে হিংসা, দ্বেষ ছুঁড়ে ফেলে বসে থাকো। তোমরা মহাকর্মীর দরজা থেকে এসেছ, ভুলে যেও না। তাই তোমাদের ধর্ম হলো কর্ম। **যে কদিন এই পৃথিবীর বুকে বাস করবে, যাঁদের জন্য বেঁচে আছো, বেঁচে থাকছো, তাঁদের স্মরণ করো। যাঁরা তোমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করে চলেছে, তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাও। তাঁদের পথের পথিক হও। সাময়িক প্রলোভনের বশে, ভুলে যেও না তোমাদের অস্তিত্বের কথা।**

মহাকাশের পঞ্চভূতের কর্মীরা (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম) যেভাবে কর্ম করে যাচ্ছে, তোমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য, সেগুলোকে রক্ষা করার জন্য বা বাড়াবার জন্য, সমানভাবে ভাগ করে চিন্তা কর। তবেই হবে এখানে (এই পৃথিবীতে) আসা সফল। আমি সমাজকে রক্ষা করার জন্য প্রেম-ভালবাসা সহ ত্রিশূল পর্যন্ত দিয়েছি। আমি মুক্ত আকাশের মুক্ত জীবনের কথাই বলছি। তোমরা মুক্তাকাশ থেকে এসেছ। মুক্তির সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখ। আমি শিব। জীবই শিব। জগৎ শিব। আবার শিবই জীব। মঙ্গলের সুর থেকে এই সৃষ্টবস্তুই, মঙ্গলের জন্য এসেছে। তাই যাতে সর্বদিকে সর্ব অবস্থায় মঙ্গল হয়, তারই জন্য আত্মোৎসর্গ কর। এই মহাশূন্য মহাসাগর যে সর্বব্যাপ্ত হয়ে, সর্বাবস্থায় সর্বত্র তার কাজ করে যাচ্ছে, সে যে কতবড় উদার, তার প্রসারতা তাকিয়ে দেখ। মহাকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, বিরাট আকারে আকার নিয়ে, সে তোমাদের কাছে এসেছে।

তাই শিব আপনমনে আপনসুরে জাগিয়েছিলেন নিজের ভিতরের সুর। সব সুর বাঁধা বিরাট সুরের সঙ্গে। তাই তিনি হুঙ্কার ধ্বনি দিয়ে জানিয়েছেন— সবার পক্ষেই এই ধ্বনি বাজাবার অধিকার আছে। তাই

প্রত্যেকেই শিবের এই মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এগিয়ে যাও। সময় যে আর নেই। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখ, আপনজন কেউ নেই। তুমিও প্রস্তুত হও সেজন্য। সামনের দিকে তাকিয়ে ভাব, আরতো সময় নেই। আমরা মহাকর্মীর সৃষ্টবস্তু। কর্মের সাধনাই আমাদের সাধনা।

সেই হিমালয় থেকে সৃষ্ট হলেন, পাষাণের কন্যা পাষাণী পার্বতী। হিমালয় থেকে সিংহকে বাহন করে ঢাল তলোয়ার, ত্রিশূল নিয়ে এগিয়ে এলেন সমাজকে দানবমুক্ত করতে। এই পাষাণী পাষাণ নয়; মায়ায় ভরা, প্রাণের স্পন্দনে ভরা। দেশের প্রীতিতে, জাতির প্রীতিতে ভরা। তাই তিনি দশপ্রহরণধারিণীরূপে দশ হাতে নেমে এলেন, সবাই যাতে দশ হাতে কাজ করে।

শিবই হলেন মা কালী। আবার কালীই হলেন শিব। কালী কি করলেন? তিনি অসুর দমন করলেন। জীবকল্যাণে খাদ্যশস্য রক্ষা করলেন। এই আদর্শ অনুসরণ কর। তারজন্য হাতে নেও অস্ত্র। বাদবিতণ্ডা ভুলে মাটির আসন গ্রহণ করো। পদ্মাসনের সুর তখন খুঁজে পাবে। যেদিন সংসারকে নিজের মনে করে সমাজকে দানবমুক্ত করতে পারবে, সেদিনই হবে যথার্থ কাজ। সর্বদাই ভাববে, এখানে সাময়িক এসেছ, এখানে 'আমার' বলে কিছু থাকবে না। যে দেহ নিয়ে এত কিছু করছো, তাও থাকবে না। যে দেশে বাস করছো, সেখানে যখন এমন নিয়ম, 'কিছু থাকবে না, কিছুই রবে না', সেখানে 'আমার' মনে করে অনধিকার কাজে এগিয়ে যাচ্ছ কেন? যেখানে 'আমার' বলে বলার অধিকার নেই, সেখানে কেন বলছো, 'এটা আমার?' প্রকৃতির নিয়মে যখন এসেছ, নিয়ম পালন করতে হবে। নিয়মের ব্যতিক্রম করলে দুর্ভোগ ভুগতে হবে। আমি সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি; জানিয়ে যাচ্ছি, ভিতরের দানব, বাইরের দানব আমার অস্ত্রে, প্রেমের অস্ত্রে, জ্ঞানের অস্ত্রে বিনাশ কর। তবেই হবে শুদ্ধ পবিত্র।

হে পথিক, যাত্রিক সাময়িক লালসাভোগে নিজেদের বলি দিও না, বলি দিও না। আমার কাছে যে বলি দেওয়ার নিয়ম, জিভটাই

(লোভটাই) বলি দাও। নিরীহ ছাগটা বলি দেওয়ার জন্য নয়। ভিতরের অসুরকে, দানবকে বলি দাও। সেই বলির মাথা গলার মালা করো। নিরীহ ছাগকে ক্ষমা করাই ধর্ম। ছাগকে বলি দিয়ে, এই অপরাধ করবে না।

অসুর দমনকল্পে শিবই কালী হলেন। সেই কালীকেই বুকের উপর রেখে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। কেন জান? ওই মায়ের আদেশ নির্দেশ, তোমরা যদি নিয়মিত পালন করে চলো, তবেই হবে মঙ্গল। শিব বলছেন, আমি শুয়ে পড়ে দেখালাম, আমার নাম মঙ্গল, আমার নাম শান্তি। সেটাকে বোঝাবার জন্য কালী হয়ে নির্দেশ দিলাম; শিব হয়ে শুয়ে পড়লাম। তাই আমিই কালী, আমিই আবার শিব।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সংসারী মানুষ জীবন সংগ্রামে পুলটিস দিতে দিতে চলেছে

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০১৭
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭০

শিব পার্বতীকে বেদ বুঝাচ্ছেন। পার্বতী প্রশ্ন করছেন, আর শিব বেদ থেকে ধরে ধরে, প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। পার্বতী সাধারণ ঘরের মানুষদের চিন্তা করে, তাদের সুখ-দুঃখের দিকে তাকিয়ে, শুধু এই কথাই বললেন যে, ''প্রভু, পৃথিবীর মানুষ কত রোগে, শোকে, দুঃখে আছে। তাদের শান্তি, তাদের মুক্তি, তাদের দর্শন কি করে হবে? এত দুঃখ, এত কষ্ট তাদের, কোনদিন কি শান্তি হবে না?'' আমাদের ঘরের মেয়ে হিসাবে পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শিব তখন বললেন, ''শ্লোক (বেদমন্ত্র) **তোমাদের যে জন্ম হয়েছে, এই জন্মটাই মূল্যবান। জন্ম যে হয়েছে, পৃথিবীতে যে জন্ম হয়েছে, এটাই আশ্চর্য। এখানে রোগ, শোক, দুঃখ যাই থাক না কেন, বেদের যে আশীর্বাদ আছে, বেদের যে আদেশ আছে, বেদের যে নির্দেশ আছে, তাতে বেদগত প্রাণ যাতে হয়, দর্শন হয়, মুক্তি হয়, তার জন্যই এগুলি দেওয়া হয়েছে।** এগুলি হচ্ছে তার সিঁড়ি। মার্বেল পাথর দিয়ে সিঁড়ি হয়, বাঁশের, কাঠের কত কিছু দিয়ে সিঁড়ি তৈরী হয়। আর রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা-যন্ত্রণা, প্রেম ভালবাসা, হতাশা, নিরাশা, চঞ্চলতা, ভালো লাগা, না লাগা, এগুলো হচ্ছে সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়ে পথ চলতে চলতে যখন সময় ঘনিয়ে আসে, তখন দেবদর্শন হয়।''

পার্বতী ঃ- প্রভু, এই ব্যথা, এই দুঃখ তো জীবজগতে সবারই। পৃথিবীতে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, সবার তবে দর্শন হবে, মুক্তি হবে?

শিব ঃ- সকলেই দর্শনের পথে, দর্শনের অভিমুখে চলেছে। মুক্তির পথে, দর্শনের পথে, অনুভূতির পথে সবাই।

পার্বতী ঃ- এই পথে যেতে যেতেই তো, শেষ হয়ে যাবে না? সকলে দর্শনের পথে, মুক্তির পথে গেলাম। তাতে তো দর্শন হলো না, শেষ হলো না। মুক্তির পথে গিয়েও যদি শেষ না পেলাম, তবে কি হবে?

শিব ঃ- পথে যখন থাকবে, তা থেকে কোন পথিক পথচ্যুত হয় না। পথে আসতে দেরী হতে পারে। পথের কাজে পথিক দেরী করতে পারে। তবে পথিক পথহারা হয় না, পথচ্যুত হয় না, হবে না।

পার্বতী ঃ- এই কথা যদি সবাইকে জানিয়ে দিই, তবে তো দোষের হবে না?

শিব ঃ- কখনই না। এই কথা সবাইকে জানিয়ে দিও তুমি নিশ্চিন্ত মনে। তুমি বলবে, ''তোমরা অনুভূতির পথে, দর্শনের পথে। তোমরা পথিক পথহারা হবে না, পথচ্যুত হবে না। তোমাদের দর্শন হবে, মুক্তি হবে। তবে, দেরী হতে পারে কিছু।''

পার্বতী ঃ- প্রভু, যাতে দেরী না হয়, প্রত্যেকেই যখন পথে আছে, সেই ব্যবস্থা আছে? পথিক যাতে তাড়াতাড়ি পথের শেষ সীমানায় পৌঁছাতে পারে, তার কি কোন বিহিত আছে?

শিব ঃ- বেদ তোমার চেয়ে বেশী গরজ করছে। সেই গরজ হলো, যাতে অতি সহজে পথিকরা যাত্রিকরা শেষ সীমানায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে, তারজন্য যত প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি, যা কিছু আছে সেইপথে যাওয়ার সাহায্য হিসাবে, বেদ পথিককে সবকিছু দিয়ে রেখেছেন। আরও বেশী সহজে যাতে হয়, বেদ তাহাও আরও বেশী করে চিন্তা করেছেন।

পার্বতী ঃ- বেদ যদি এত চিন্তা করে থাকেন, তবে তো পৃথিবীর লোকের কোন চিন্তাই নাই।

শিব ঃ- তরী (নৌকা) অপেক্ষা করে আছে, কখন জোয়ার আসবে। সকলে জোয়ারমুখী করে তরী ভাসায়। জোয়ারমুখী করে তরী ভাসানো হয়। আর পৃথিবীর জীবজগতের জন্য যে তরী ঠিক করে রাখা হয়েছে, তাতো ভাঁটাতে আটকায় না। কোথাও ঠেকেও থাকে না। সে আপনি বয়ে চলে।

পার্বতী ঃ- তাকে বাইতে তো হবে?

শিব ঃ- বাইলে তাড়াতাড়ি হয়। তবু জোয়ার যখন আসবে, না বাইলেও আপনি চলে যাবে।

পার্বতী ঃ- ভাঁটাতেও নামবে না?

শিব ঃ- না। যদি বাইয়ে (বেয়ে) নেয়, তবে তাড়াতাড়ি হয়।

পার্বতী ঃ- যিনি হাল ধরে থাকেন, তিনি যদি হাল থেকে বিচ্যুত হয়ে যান, তবে তরী এদিক ওদিক হবে না?

শিব ঃ- ঐ যে হাল দেওয়া আছে, সেটা পথিকের তৈরী নয়। ওটা প্রকৃতি প্রদত্ত; স্রষ্টার চিরন্তন হাল। ওটা চিরদিন একমুখী হয়ে আছে। ওটাকে (হালটাকে) ধরে রাখবারও প্রয়োজন হয় না। ওটা ভাঙ্গে না, নড়েচড়েও না। ওটাকে ইচ্ছামতন বাঁধা যায় না। কেউ এটাকে টলাতেও পারবে না, নড়াতেও পারবে না, এটা এমনভাবে বাঁধা। ঐ একমুখী ছাড়া, অন্যমুখী হবার প্রয়োজনই হয় না, অন্যমুখে যায়ও না।

পার্বতী ঃ- বেদ এত চিন্তা করেন সবার জন্য?

শিব ঃ- শ্লোক (বেদমন্ত্র) .....। পার্বতী, বেদ যে এত চিন্তা করেন, বাস্তবের দিকে একটু তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। সৃষ্টির দিকে তাকালে সবার জন্য যে করেন, তা কি বুঝতে পার না? **কত অপূর্ব, কত সুন্দর এই সৃষ্টি। প্রত্যেকটি প্রয়োজনের সাথে সাথে প্রতিটি প্রয়োজন তিনি মিটিয়ে রেখেছেন। কবে কি হবে, হাজার বছর পরে কি হবে, হাজার বছর আগে থেকে সুচিন্তা করে, তার সুবন্দোবস্ত করে রেখেছেন।** তুমি জীবজগতের দিকে একটু তাকিয়ে যদি দেখ, তবে বুঝবে, তিনি কত বড় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ এবং সব কিছু বুঝেশুনে আগেই সব ঠিক করে রেখেছেন। সব দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

পার্বতী ঃ- প্রভু, সেতো ঠিকই। তবে কেন মানুষ ভুল করে? ভগবানের পথে যদি সবাই থেকেই থাকে, তবে জীবজগৎ কেন বোঝে না? ভগবানের পথে যদি থাকে, তবু কেন ভগবানকে পাবার জন্য

ডাকে? কেন মানুষ হা-হুতাশ করে? এর কি উপায়? তারা যদি বোঝে আমরা পথিক, আমরা পথে আছি, এটা বুঝলেই তো হয়। সেটা কেন বোঝে না?

শিব ঃ- পথিকরা কেহই ভুল করে না। ভুল করছে, দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে বলে যে মনে হয়, তারা কিন্তু পথচ্যুত হয় না। অনন্ত গতির পথে গতিময় হয়েই, চলার পথে তারা চলতে থাকে। পৃথিবী যে ঘুরছে দিবারাত্র, টের পাও কি? শুধু দেখছো, সূর্য পশ্চিমদিকে অস্ত যায় আর পূর্বদিকে ওঠে। পৃথিবী ঘুরছে টের পেলে, এভাব ওভাব করতে। টের পাও না বলেই নিশ্চিন্ত আছ। যদি টের পেতে, তবে কি হাঁটতে পারতে? মাথা ঘুরছে না, পড়ে যাচ্ছ না। কিন্তু পৃথিবী যে ঘুরছে, টের পাও বা না পাও, পৃথিবীর বুকেই তো বাসা বেঁধেছ।

পার্বতী ঃ- হ্যাঁ, প্রভু।

শিব ঃ- দেবতার পথে, মুক্তির পথে যারা আছে, দেবতাকে বুঝুক না বুঝুক, সেখানে ভুল করবেই। টের পেলে তো হয়েই গেল। **সাধারণ একটু মাথা ঘুরলেই সব ঘুরতে থাকে, মাথায় হাত দিয়ে বসে যায়। আর মুক্তির পথে দেবতার দর্শন হচ্ছে না; দেবতার দর্শন যদি হতো, দর্শন হয়ে গেলে বিপদ হতো, মুস্কিল হতো। তাল সামলাতে পারতো না, গুছাতে পারতো না।** কেউ পথহারা হবে না। তোমাদের টের পাওয়া বা না পাওয়া, ভুল করা বা না করা, তারজন্য কিছু আটকাবে না। তোমরা টের না পেলেও, পৃথিবী হতে তো সরে যাচ্ছ না।

পার্বতী ঃ- প্রভু, ভুল তো সবাই করছে। আনন্দের রস, আত্মহারার রস যদি একটু পেতো, তবে তো আর ভুল করতো না।

শিব ঃ- তুমি যে কথা বলছো, সবটাই তোমার চর্মের আবরণের কথা। তুমি তোমার জিহ্বা, দেহের ইন্দ্রিয় যা চায়, সেই কথাই বলছো। যা খেতে ভালবাস, পরতে ভালবাস, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দেহের স্বাদ সোয়াদের তৃপ্তি, এটাই দেহ প্রথম চায়। দেহের বৃত্তির নিবৃত্তিই দেহ চায়। দেহ তার স্বাদ সোয়াদের তৃপ্তি চাইতে গিয়ে, বাইরের ইন্দ্রিয়ের চাওয়াটাকেই ভিত্তি করে চাইছে। কিন্তু তুমি সেই পরম পথের পথিক।

এই ইন্দ্রিয়ের চাওয়া দিয়ে, ঐ চাওয়াটাকে মিটাতে পারবে না। তুমি ভুল করবে। এই ভুলটাই বেশীরভাগ মানুষ করে। এই ইন্দ্রিয়ের চাওয়া দিয়ে, ঐ চাওয়াটা মিটাতে গিয়েই বেশীরভাগ ভুল করে।

পার্বতী ঃ- এই চাওয়াটাইতো সবাই চাইছে। তবে ঐখানের চাওয়াটা কিভাবে মিটবে?

শিব ঃ- এখানকার যে চাওয়া, তাতো চিরকালের জন্য নয়। এটা চিরকাল থাকছে না। এখানকার যে জিনিস চাইছো, তার সাথে সাথে আমরা আমাদের ব্যথা বেদনাকেই, আপ্যায়ন করে নিয়ে আসছি। ছেলে ছেলে করে ছেলে হলো, তারপর মেয়ের জন্য অশান্তি। মেয়ে হলো। ক্রমে বাবা গেল, মেয়ে গেল। অশান্তি বাড়তে লাগলো। সৃষ্টি তো করলে স্বাদে। কিন্তু অশান্তিতে ভোগান্তিতে স্বাদের তাগিদে যে বিস্বাদ শুরু হলো। ছেলে বিয়ে দিলে। বৌ যে এল, খেতে দিল না। তারপর নাতিপুতি আসছে। শ্মশানে নিয়ে গেল। কোন্ শান্তিটা পাইতাছ? চাওয়াটা যে মিটাতে চাইছো, কোন্ চাওয়াটা মিটলো আগাগোড়া? এই চাওয়াগুলির চেহারা দিয়ে, বোঝ না? তবে এখানকার চাওয়া দিয়ে কি পাবে? এই চাওয়া দিয়ে তৃপ্তি পাইতে চাও? এই চাওয়া মিটাতে গিয়ে, সারাটা জীবন শুধু থাপ্পর খেতে খেতে চলছো। একটাতেও সোয়াস্তি (স্বস্তি) আছে?

না, এখানকার তৃপ্তি দিয়ে ওখানকার শান্তি পেতে চেও না। এখানকার জিহ্বা, নাসিকা দিয়ে তৃপ্তি পেতে চেও না। এখন তুমি যদি বলো, সাগরের জল পেতে চাই, তবে তাতে হাবুডুবু খেতে হবে। বাতাসেও সাগরের জল আছে। কিন্তু বাতাসের জলে ডুবছো না। বাতাসেই ঐ জল পাচ্ছ। অন্যভাবে অন্যপথে পাচ্ছ। তোমার অন্তর্নিহিত যে চাওয়া, তা যদি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে যায়, খাবলাখাবলি করে, তবে চাওয়া মিটে না। তোমার চাওয়া ইন্দ্রিয়ের স্বাদ, এখানকার স্বাদ যখন মিটে না, তখন স্বাদের জন্য উন্মাদ হয়ে বলছো, ''আমি স্বাদ চাই, আনন্দ চাই, চিদানন্দ চাই, পরম তৃপ্তি চাই।'' তাহা খুঁজতে গিয়ে কত ব্যথা, কত আঘাত, কত লাঞ্ছনা। শেষবেলা এই 'হরি বল ভাই' করে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। তুমি সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাচ্ছ। কারও সাথে কেউ সম্পর্ক

রাখে না। নিজের দেহও রাখে না। **সারাজীবন ধরে কি চেয়েছ, আর কি পেয়েছ? কোন আশাই মেটেনি। সব দিলেও এই চাওয়া মিটে না। এই বাস্তবের সাধ, এই চাওয়ার যে সুর, ঐ সুরটাই হলো অনন্ত। মানুষের মহাশক্তির সুর অন্তর্নিহিত আছে ঐ চাওয়ার মাঝে। ঐ সুরটাই সর্বদা দেহের ভিতর জাগছে, চাই, চাই, চাই।**

ঐ চাওয়ার ক্ষুধা মিটানোর জন্য সারাজীবন জর্জরিত; ছেলে, মেয়ে অসুখে বিসুখে হাসপাতালে। চুরি, ডাকাতি, খুন একটার পর একটা। ওরে বাপরে বাপ। একটু পরমানন্দের রস, পরমানন্দের স্বাদ চাইতে গিয়ে যে এত বিপদ, এত জ্বালা, এত অপরাধ, তাতো জানা ছিল না। শান্তি চাইতে গিয়েছিলাম। রোগে শোকে জর্জরিত জীবনের মাঝে শান্তি চাওয়াতে যে, এত ঝঞ্ঝাট, ঘরে বাইরে এত বিপদ, এত জ্বালা, বুঝতে পারিনি। মনে হয়, এটা করলে শান্তি পাব। তা করলেও শান্তি পাওয়া যায় না। আর একটি অশান্তি এসে উপস্থিত হয়। এই তো চলছে সংসারে। পোলা (ছেলে) নকশাল করে বেরিয়ে গেছে। স্বামীর চাকরি নাই। খাওয়া জোটে না। শীতের কাপড় নাই। পরনের বস্ত্র নাই। এদিকে ঘরের চাল ফুটা। বৃষ্টি হলেই ঘরে জল পড়ে। চাইতে চাইতে সব বরবাদ হয়ে গেল। বাচ্চারা রোগে ভুগে ভুগে একটা মরে। কিছুদিন পরে আর একটা মরে। স্বামী মরে। কিন্তু এদিক দিয়ে আনন্দের আশা আছে। এ যেন নারদের সংসার। মুহূর্ত্তে সব শেষ হয়ে গেল। কি নারদ, দেখছো তো?

নারদ ঃ- আজ্ঞে হ্যাঁ। আর বেশী দেখতে চাই না। কয়েকদিনের জন্য সংসার পাততে গিয়ে, যে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমরা এই হাবুডুবুর মধ্যে থেকেও আশা ছাড়ি না। **সংসারী মানুষ জীবন সংগ্রামে পুলটিস দিতে দিতে চলেছে। একজনের একটা মশারি ছিল। মশারি ছেঁড়ে, আর সে তালি দেয়। তালি দিতে দিতে দেখা গেল, আসলটাই নাই। সুতরাং আমাদের জীবনটাও তালিতে ভরা। তাই কেবল তালি আর পুলটিস। আসলটা আর নাই।**

শিব পার্বতীকে বললেন, দেখ, বেদ কিন্তু তোমাদের ঠকায়নি।

পার্বতী ঃ- সেটা কি প্রভু?

শিব ঃ- ঐ যে জীব অনর্গল অবিরাম একটা সুখের কামনা করে চলেছে। একটা ছোট পিঁপড়া থেকে শুরু করে, সবাই এই সুখের কামনা করতে চায়। আর সুখের কামনা করতে গিয়েই ওল্লা (বড় কালো পিঁপড়া) গুড়ের হাঁড়িতে পড়ে। আগে এক ঠ্যাং বাড়ায়। তারপর আর এক ঠ্যাং বাড়ায়। তারপর ওটার মধ্যে পড়ে। ঐ গুড় খেয়ে গুড়ের আঠায় আটকে যায়। আর উঠতে পারে না। ওটার মধ্যেই মরে। ঐ গুড়ের হাঁড়িতেই ওল্লা মরে। কাজেই সুখের আশা করতে গিয়ে আমরা ঝড়ে পড়ি। এই ঝড়ে পরে মার খাই।

পার্বতী ঃ- প্রভু, তবে সুখের আশা কি করবো না? সুখের কামনা বাসনা কি কোনদিন মিটবে না?

শিব ঃ- সুখের কামনা বাসনা, তার যে কার্যকাল, সেটা ধ্বনিকে বহন করে, তা জান? তোমার যে সন্তান গণেশ, এত বড় গণেশ, তাকে কি এনে দিলে? দিলে কিনা একটা ছুঁচো বাহন। আর বাহন খুঁজে পেলে না। কাজেই **বাহন দিয়ে দেবতাকে বিচার করা চলে না। দেবতারা কখন যে কার উপর চড়ে কি কাজ করেন, কখনও ঘোড়ায় চড়েন, কখনও গাধায় চড়ে কাজ সারেন, তা (বাহন) দিয়ে দেবতাকে বিচার করলে চলবে না। কাজেই সুখের আশা যে করে, তাকে সংসারের এই রোগ, শোক, কতরকমের জঞ্জাল, ঝঞ্ঝাট সবই বহন করতে হয়। এ সবই ঢেউ; এতে উথাল-পাথাল করে নিয়ে যাচ্ছে।** ওইসব বাহন, ওরা (সংসারী জীবরা) বহন করবে। তারজন্য এতটুকু কারও ক্ষতি হবে না। তাই সংসারে যে অশান্তি, সংসারে যে অশান্তির ঝড়, এই ঝড় বহন করছে সেই চিদানন্দের, পরমানন্দের সুর।

পার্বতী ঃ- তবে জীবজগৎ সবাইতো, পরমানন্দের সাধনা করছে।

শিব ঃ- এতক্ষণে তবে তুমি একটু বুঝেছ।

পার্বতী ঃ- না প্রভু, এখনও বুঝি নাই।

শিব ঃ- সেই পরমানন্দের সাধনা জীবজগৎ সবাই করছে।

পরমানন্দের এবং পরমবস্তুর সাধনায় সবাই পরোক্ষভাবে মগ্ন হয়ে রয়েছে।

পার্বতী ঃ- বুঝে মনে হয়, করছে না।

শিব ঃ- বুঝে করুক বা না করুক, তাতে আসে যায় না কিছু। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে আপনাআপনি সেই যে পরমবস্তু, তার সাধনায় সে ব্যস্ত হয়ে আছে। তোমরা সেটা বুঝতে পারবে। সর্ব জ্বালা যন্ত্রণার মাঝে একটিমাত্র আশা উঁকি দিয়ে বলছে, একটু সুখ চাই, আনন্দ চাই, একটু শান্তি চাই। ঐ শান্তি, পরম শান্তি পাবার কামনা; শান্তি, দেবতাকে পাবার কামনা।

পার্বতী ঃ- পরমানন্দের সাধনা, দেবতার কামনা যারা করছে, তারা যদি একটু স্বাদ পেতো, তবে ভাল হতো।

শিব ঃ- ঐতো আবার স্বাদে এসে পড়লে। স্বাদে এসো না। স্বাদের কথা বলো না। **জল, বাতাস যা দিয়ে জীবন রক্ষা হচ্ছে, তার কি স্বাদ আছে? সেখানে স্বাদ হয় না। যে বস্তু দিয়ে জীবন, তার স্বাদ নাই। শুধু চোখ, মুখ, জিভ নেড়ে কাজ হয় না। পরম বস্তুর সাধনায় দিশেহারা হয়ে, আত্মহারা হয়ে আপনসুখে মগ্ন থাকে যে লোক, তাকে হাঁ করে থাকতে হয়।** সেখানে স্বাদ সোয়াদের কোন বালাই নেই।

পার্বতী ঃ- তবে তৃপ্তি?

শিব ঃ- এই যে অনন্তজীবনে তৃপ্তির সাধনায়, আনন্দের সাধনায়, সুখের সাধনায় কোটি কোটি জনম কাটিয়ে এসেছো এবং চলছো, এক মুহূর্ত্তের জন্য হলেও তো, কোনদিন মুহূর্ত্তের তৃপ্তি পেয়েছো। আর সেই তৃপ্তির সুরই টেনে নিয়ে যাচ্ছে মহানন্দের সাগরে, অনন্ত তৃপ্তির সাগরে; যেখানে তৃপ্তিতে ভরা, তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। সেখানে যখন যাবে, যে তৃপ্তির স্বাদ পাবে, তখন এই চোখ, মুখ, জিহ্বা, এইসব ইন্দ্রিয়গুলো, নিজস্ব স্বাদ নেবার আর অবসর পাবে না। পরমানন্দের স্বাদ যখন পাবে, পরমবস্তুর সন্ধান যখন পাবে, এত স্বাদে সোয়াদে আত্মহারা হয়ে যাবে যে, তখন তোমাতে আর তাতে এক হয়ে যাবে। তৃপ্তিই যদি তৃপ্ত হয়ে যায়, তবে

তৃপ্তি পাবে কে? এক কথায় আর তখন থাকবে না তৃপ্তি। কারণ তখন নিজেই তৃপ্ত হয়ে গেছে। তোমার কামনা, বাসনা, সুখের যে আনন্দ, সে নিজেই যদি আনন্দময় হয়ে যায়, কে তৃপ্তি পাবে? কে আনন্দ পাবে? **তুমিই যদি তৃপ্তির সাগরে ডুবে যাও, তবে তোমার চাওয়ার কি থাকে? জীব যতক্ষণ না পায়, ততক্ষণই পাওয়ার মাঝে এগিয়ে যায়। যখন পাওয়া শেষ হয়ে যায়, তখন তো আর চায় না। যখন তোমার দেনা-পাওনা মিটে গেল, তখন পাওয়ার কিছু থাকে না। শুধু থাকে সুদূরের বার্তা, থাকে সুদূরের ধ্বনি।** সেটা কিভাবে থাকে? পরমানন্দের সুর নিয়ে, গভীর টানে আপনা আপনি এগিয়ে চলে। যেই আকাশের মাঝে এগিয়ে চলে, সেই আকাশের কিছু নেই; সব ফাঁকা। আবার ফাঁকার মাঝেই সব আঁকা। সেই ফাঁকাতেই আবার তৃপ্তির আনন্দ। মনে রেখো, এই কথাটি তোমাতে আর তাতে তখন এক হয়ে যাবে।

পার্বতী ঃ- প্রভু, আমার শেষ কথা। আমার আত্মা তোমাতে লীন হয়ে আছে তো? আমি তোমার আত্মার মাঝে লীন হতে চাই।

শিব ঃ- এখনও হয় নাই। কারণ 'আছে তো'? এই বোধ এখনও আছে। সেটাই তুমি বলছো।

পার্বতী ঃ- এখনও হয় নাই?

শিব ঃ- মাঝে মাঝে হও। আমি পথিক, তুমি যাত্রিক। মিলনের পথে মিলিত হতে বাধ্য হবে। মিলতি নিয়েই জগতের সৃষ্টি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে তারই যোগ, তারই সাধনা। মিলন অনিবার্য।

পার্বতী ঃ- জীবজগৎকে কি বলবো? তারা কি নিয়ে কোন্ মিলনের পথে এগিয়ে যাবে?

শিব ঃ- তারা সেই ধ্বনি নিয়ে চলবে। তারা অভাবের তাড়ণা, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, কান্নার বোল নিয়ে এগিয়ে যাবে। ঐ বোলে বোল দিয়ে এখানকার যা কিছু, সেই ধ্বনির সাথে মিশিয়ে দাও; যে সুরধ্বনি, আকাশের ধ্বনি, সেই ধ্বনির সাথে মিশিয়ে দাও। আকাশের সুরে যে সুর আছে, সেই সুরে সব মিলিয়ে দাও। সেদিন আমার কণ্ঠে

(বিশুদ্ধে), আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে আমাকে দেখেছিলে। সেকথা ভুলে গেছো কি পার্বতী? দেবর্ষিও দেখেছে, তুমিও দেখেছো। তবে তুমি ভুলে গেছো। আমি যখন বেদের সুরে সুরময় হয়ে, একসুরে টান দিয়েছিলাম, যখন বেদের সুরে এক হয়ে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেও তোমাকে ডেকেছিলাম, 'পার্বতী এসো।' তখন তুমি কি দেখেছিলে, বলো? সেই কথাই তুমি বার বার করে বলবে। সেই কথাই তুমি বারবার উচ্চারণ করবে। অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে আছে সেই সুর, সেই গান, সেই ধ্বনি। তুমি যা দেখেছো, সেই কথাই তুমি জীবজগৎকে জানিয়ে দিও, বুঝিয়ে দিও, শুনিয়ে দিও।

পার্বতী ঃ- প্রভু, তুমি এই আশীর্ব্বাদ করো, পৃথিবীর সবাইকে, আমার ভাই, আমার ঘরের সবাইকে আমি সেই কথা জানাবো। এই হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে, সমস্ত জীবজগৎকে উদ্দেশ্য করে, যেই নির্দেশ তুমি দিয়েছ, আর যাহা আমি দর্শন করেছিলাম, আজ্ঞাচক্রের সুরে সেই ধ্বনি আমি জীবজগৎকে শুনাব।

সেই পার্বতীর ত্রিনয়ন, সেই আজ্ঞাচক্র, সেই ত্রিনয়নের সুরে পার্বতী বললেন, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঃ- আজ্ঞাচক্র দিয়ে পার্বতী তোমাদের কাছে এই নাম দিয়েছিলেন, হিমালয়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে। আজ তোমাদের কাছে পার্বতীর কথা বললাম। পার্বতীর কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম। পার্বতী আর একটি কথা বিষ্ণুকে বলেছিলেন। পার্বতী বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''বাস্তবের শান্তি কি করে হবে?''

বিষ্ণু ঃ- **সমস্ত বাক্যের উর্দ্ধে, চিন্তার উর্দ্ধে থেকে, শুধু এই কথাটি, রাম নারায়ণ রাম, এই মহামন্ত্রটি যদি উচ্চারণ করো, তাহলে আর চিন্তা নেই। সমস্ত দেশময় প্রচারার্থে, দেশের মঙ্গলার্থে যদি দলে দলে বাহির হয়ে যাও, আর এই মহানাম উচ্চারণ করো, তবে বিশ্বের কোন শক্তি নাই, তোমাদের পরাজিত করতে পারে। কারও ক্ষমতা নাই, একে রুখতে পারে। জয়ের পতাকা তোমাদের হাতে আসবেই।**

আজকের এই পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে, আমাদের অন্য জাতীয় সঙ্গীতের দরকার নাই। এই 'রাম নারায়ণ রাম', এটাই হবে National Song, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। এটাই হবে আমাদের অন্তরের সঙ্গীত। ইহলোক, পরলোক, এই জগৎ, অনন্ত বিশ্ব, সর্বত্র এটাই এক মন্ত্র, জীবজগতের সঙ্গীত। এটাই একমাত্র জাতীয় সঙ্গীত।

আমরা দলে দলে বাহির হবো। প্রতিষ্ঠা করবো বেদের সুর, বেদের বাণী, দেবতার বাণী। আমরা বেদের সাম্যের গান প্রতিষ্ঠা করবো। তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে গুরুগতপ্রাণ হয়ে, তোমরা দেবতাদের সেই বাণী বহন করে, এই একমাত্র নাম, একমাত্র ধ্বনি, এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করবে। এটাই বেদের ধ্বনি; এই রাম নারায়ণ রাম মহামন্ত্রই দেবতাদের শিরোমণি। জগৎময় এটা গেঁথে নিয়ে চলো। এই মহামন্ত্রই দেবর্ষি তাঁর মূলাধার হতে সহস্রারে বাঁধলেন। আর রাস্তায় নেমে দ্বারে দ্বারে ঘাটে মাঠে সবাইকে বলে বলে, সবাইকে এক করে নিয়ে এলেন। তাই সব দেবতা, সমস্ত ঋষিদের প্রাণের আকুতি, তাঁদের একমাত্র ইচ্ছা এটাই। এই মহানামের সুরে তাঁরা তন্ময় হয়ে রয়েছেন।

এই কথাটিই আমি তাঁদেরই মাধ্যম হয়ে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করছি এবং তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। আজও দেবতার মন্ত্রে এই কথাটিই বাজছে, ''রাম নারায়ণ রাম''। আজও পার্বতীর ত্রিনয়নে সেই কথাটিই বাজছে, ''রাম নারায়ণ রাম''। আজও দেবর্ষির বীণাযন্ত্রে সেই কথাটিই বাজছে, ''রাম নারায়ণ রাম''।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

শিব দেহ রাখেননি। তাঁর দেহ নিয়ে শ্মশানেও যায়নি। তিনি জমাট হয়ে গিয়ে পাথর হয়ে গেছেন।

পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা
১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৬

এই চৈতন্যময় জগতে সব কিছুরই প্রাণ আছে। কোনটা বুঝা যায়। কোনটা এমনি দেখলে, বুঝা যায় না। একটা পাথরকে যে মানুষ সাধনা করে, বিভিন্ন মন্দিরে বা জায়গায় জায়গায় যে পাথরের মূর্তি গড়ে পূজা করে, পাথরকে কেন বেছে নেয়? পাথর যে মাটির তেজোকণা হতে গড়েছে, সেই মাটি থেকে আমাদের দেহ, জীবলোক। আমরা সবাই মাটি থেকে গড়ে উঠেছি। মাটির রূপ একদিকে কথা বলে, নড়াচড়া করে। মাটির আর একরূপ কথা বলে না, নড়াচড়া করে না। মাটি আর একদিকে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রয়েছে বহুরূপে। মাটির রূপ হতে যে পাথর হয়, সেই পাথরের কি জ্ঞান বিচার নেই? পাথরের জ্ঞানবিচার আছে কি? যেমনি করে আমরা আছি, তোমরা আছ? রক্তমাংসের শরীরে স্পর্শ করলে অনুভব আছে।

মাটি হতেই গড়া গাছপালা। তা থেকে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। মাটি থেকেই নানা ধাতু। তা হতে সেই যে পাথরের রূপ, সেই **পাথরে জীবের মত কোন সাড়া আছে কি না, প্রাণ আছে কি না। সেই পাথরকেই যাহা মন্দিরে মন্দিরে পূজা করা হয়, সেই পাথরকে কেন পূজা করছে? সাধকরা পাথরে নিশ্চয়ই এমন কিছুর খোঁজ পেয়েছেন, যার জন্য পাথরের পূজা করছেন। তাঁরা পাথরের মধ্যে প্রাণের সাড়া পেয়েছেন।** আমাদের এখানে হিমালয় পর্বত পাথরে গড়ে উঠেছে। বিরাট পর্বত সম্পূর্ণ

পাথরময় হয়ে রয়েছে। পর্বত অনেক আছে; অনেক উঁচু, সবটাই পাথর। পাথর হতেই যতসব অলঙ্কার হয়েছে; সোনা, লোহা হয়েছে, যাতে সবচেয়ে বেশী উপকার হয়। সোনা হতে লোহা অনেকবেশী দরকারী। সোনা না হলেও চলবে। কিন্তু লোহা না হলে চলবে না। প্রস্তর যুগে প্রস্তরই ছিল। তা হতে খুঁজে পেল লোহা, হীরে। এই পাথরেই সব আছে। পাথরে সোনা আছে, লোহা আছে। আমরা হীরেটাই বেছে নিই। **মানুষ গ্রহের দোষে পড়লে পাথর ধারণ করে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে সেই পাথরের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং অন্যান্য গ্রহের সাথে তার যোগাযোগ আছে। ঐ পাথর ধারণ করলে, সেই গ্রহের আলো বা তেজ এই পাথরে পড়ে। তাতে শরীরের স্পর্শে কাজ হয়।**

পাথরের মধ্যে যে প্রাণ আছে, এটা কি করে পেল বা জানলো? যত বিরাট বিরাট মহান, যাঁরা এখানে সাধনা করে গেছেন, দেখা গেছে তাঁরা অনেকে জমে পাথর হয়ে গেছেন। আগে যেমন দেবতারা যখন রূপ নিতেন, আবার তাঁরা জমে পাথর হয়ে যেতেন। আমাদের শরীরটায় হাড্ডিই বেশী। আমাদের শরীরও প্রস্তরের মতই গড়া, কেমন হাড়গুলোও পাথর মাফিক, পাথরের মত শক্ত। পাথরের সাথে হাড়গুলোর যোগাযোগ আছে। সমস্ত শরীরটা হাড়ের উপর রয়েছে। পৃথিবীটা খুঁড়লে খালি পাথর। এগুলো মনে হয় যেন পৃথিবীরই অঙ্গ। যত জায়গায় যাও। সাগরে যাও, খালি পাথরের খেলা। সেই পাথরে কি করে প্রাণের সাড়া পেল? যখন পর্বতের সৃষ্টি হলো, পাথরগুলো নড়াচড়া করতো, যাতায়াত করতো। পাহাড়ের গায়ে কথা বলতো। শব্দের সাথে সাথে আর একটা শব্দ তৈরী হয়। পাথরের এমন শক্তি আছে, ঐ শব্দ দূর থেকে টেনে নেয়। **পাথরের টেনে নেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। পাথর ব্যবহার করলে, টেনে রেখে দেয়। কুগ্রহে যেতে দেয় না। সেরকম পাথর ব্যবহারে টেনে রেখে দেয়, খারাপ কিছু করে না। পাথর মনের উপর কাজ করে।** যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, ধীরে ধীরে মানুষ যখন পাথরের মূর্তি গড়ে পূজা আরম্ভ করলো, তারা সাড়া পেত। আজও মানুষ পাথরে কিছু দেখলেই পূজা করে। পাথরের পূজা যারা করতো, এই পাথরেই সাধনার জিনিস খুঁজে পেল। যখন হতে পাথরের পূজা শুরু হল, মনে কর, সাদা পাথর বা কালো রং-এর পাথর,

মনের সাথে সাথে পাথরের রং বদলাতে শুরু করলো। মনের সাথে সাথে পাথরের রং বদলায় কি করে?

এ্যাসিড দিলে যেমন রং-এর পরিবর্ত্তন হয়, মনটা পাথরে রেখে যদি নজর রাখ বা জপ করো, তাহলে মনটা এমন এ্যাসিডের মতো কাজ করবে যে, একটা তাপের সৃষ্টি হবে। পাথরে আগুনের শক্তি আছে বলেই, পাথরে পাথরে ঘষলে আলো জ্বলে। বৈদ্যুতিক শক্তিটাও পাথরের মতো। তুমি যখন মনের ঘর্ষণ পাথরে দিতে থাকলে, তখন ঐটা জ্বলতে থাকে। পাথর ঐ মনটা টেনে রাখতে চেষ্টা করে, যাতে মাটির সাথে, তেজের সাথে মিলে যায়। তেজের সাথে মিলে যাবার চেষ্টা করে, সূর্যের সাথে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে রং-এরও পরিবর্ত্তন হতে থাকে। পাথরের মূর্ত্তিতে এরকম চিন্তা করলে, অদ্ভুত আকার প্রকার নিতে পারে। তুমি যদি ঠিক ঠিকভাবে কাজ কর, রাত্রে রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। ঐ যে সাধারণ শিলা আছে মশলা বাটে, একজন বাটতে বাটতে জপ করছে; দেখে, শিলাটা ঘট ঘট করে নড়তে আছে। শব্দটা টেনে নেয়। আমাদের ডাকটা, ষ্টোনে পাথরে নিয়ে নেয়। শালগ্রাম শিলা শিব। **শিব দেহ রাখেননি। তাঁর দেহ নিয়ে শ্মশানে যায়নি। তিনি (শিব) জমাট হয়ে গিয়ে পাথর হয়ে গেছেন। কোটি কোটি পাথর পড়ে আছে। প্রত্যেকটি পাথর মনে হচ্ছে জাগ্রত, ঘট্ ঘট্ করে লাফাচ্ছে।** সমস্ত জায়গায় আদি হতে শুরু করে, পাথরের প্রত্যেকটি সত্তা যেন জাগ্রত, যেন প্রাণ আছে। এই প্রাণ মাটিতে আছে, গাছে আছে। তাই এরা পরিবর্ত্তিত হয়।

পাথর অনেকরকম থাকে। পৃথিবীটা প্রকারান্তরে একটা পাথর। সূর্যটা সম্পূর্ণ একটা পাথরে গড়ানোর মত, যেটায় সবসময় আগুন জ্বলছে। সাধনার পক্ষে পাথরকে চিন্তা করে, অল্পেতেই সুর পায়। অল্পেতে যে সুর, পাথর কোথা থেকে পায়? সহজে আলো হতে বা তেজ হতে টেনে আনে। আমরা সূর্যের চিন্তা করে যতটা না পাই, পাথর হতে টেনে আনলে অতি দ্রুত পাব। **একটা পাথরে যে কত শক্তি আছে, অদ্ভুত। আমাদের দেশে এটা ব্যাবসায়িক বুদ্ধিতে আনাতে রকমারী হয়েছে, বিকৃত হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের যদি জানতে চেষ্টা করে, তবে বুঝে নেওয়া যায় যে, পাথরে**

প্রাণ আছে।

আজ সুখচরে গিয়েছিলাম। সেখানে তিনটি কালো পাথরের শিব ও একটি সাদা পাথরের শিবমূর্ত্তি আছে। এটি ৫০০ বছরের আগের মূর্ত্তি। আমি চিন্তা করেছি একটু, হাজার হাজার বছর আগে চলে গেছি। বহু বহু ব্যক্তির প্রার্থনা, চাওয়া, জপ অনেক কিছু যেন তাঁর মধ্যে ভরপুর হয়ে আছে। অনেক মহান আছেন, বড় বড় সব, যেন এঁর ভিতরে (শিবমূর্তির ভিতরে) ডুবে রয়েছেন। একটু চিন্তা করলেই সজাগ হয়ে ওঠে। অনেক পাথর আছে, জল দিলেই কেমন জ্বলে ওঠে, সজাগ হয়ে ওঠে, চিন্তা করলে। পাথরগুলো যেন টেপ রেকর্ডের মতো। টেপে যদি কথাগুলো আটক থাকতে পারে, তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ শক্তিসম্পন্ন ঐসব পাথরে, আমাদের সব কিছু আটক ছিল। আদি যুগে একজন পাথরে বলে গেল, 'আমি যাচ্ছি, তুমি এস।' পাথরে ঐ কথাগুলো সজীব থাকতো। ষ্টোন হতে বললো, 'ঐখানে একজন সাধক বসে আছে।' আজও ঋষিরা বলছে পার্বত্য পথে, 'পথিক, তুমি ঐদিকে যাও,' কে যে বললো, দেখতে পেল না। মানুষ যুগ যুগ ধরে পাথরে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের পাথরের প্রয়োজনীয়তা যে কত, তাই দেখছি। পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরী করে, পাথরের থালা, বাটিতে খাবার খায়। পাথরের মত এরকম সুন্দর জিনিস, চিন্তা করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

সাধারণ একটা প্রস্তরের মধ্যে প্রতি পর্দায় পর্দায়, অণুতে অণুতে সুর খেলছে। আমরা তার সাথে সুর মেশাই না। আমরা পাথরের মূল্য দিই না। একটুও কেউ চিন্তা করে না। আমরা মার্বেল খেলি। আজকে চিন্তা করছিলাম সুখচরে, দেখি, মহাপ্রভু ওখানে (শিবমূর্তির সামনে) এসেছিলেন। তার আগেও এসেছেন অনেকে। এই যে কালীঘাটে গেছিলাম। কত ব্যক্তি এসেছেন। কত ব্যক্তির চাহিদা জমাট হয়ে রয়েছে। সব কথা জমাট হয়ে থাকার ফলে তুমি যখন যাচ্ছ, অত অত ব্যক্তির কথা জানার সুযোগ আছে তোমার। এই মেঘ বাড়েও না, কমেও না। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ খেলে যায়। মেঘে বিদ্যুৎ খেলে। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ কি করে হয়? দুটো জমাট হবার আগে যখন ঘর্ষণ হয়, শুধু কি ধাক্কাই খায়? পাথর ছিটকে

পড়ে। তারা, উল্কাগুলো যেমন ছুটে ছুটে যায়, পাথরের চাকা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। বিরাট বিরাট পাথর পড়ে। এমনি আলো জ্বলে না, স্পীডে জ্বলে। সমস্ত কণাগুলো সব দ্রুতগতিতে পাথর হয়ে যাচ্ছে। এই জলকণা বরফ হয়ে যায়। দুটো বৈদ্যুতিক শক্তির সংস্পর্শে পাথরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। মেঘের ভিতর যেমন জল, ভূমিতে আমাদের সুবিধার জন্য, আমাদের মনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য পাথরের সৃষ্টি হল, যাতে অনেককাল থাকতে পারে। দেখ, **গয়াতে এই বিষ্ণুর পাদপদ্ম কতকাল থেকে আছে। লক্ষ বছর হয়ে গেছে। স্মৃতিটা পাথর যতটা পৌঁছে দিতে পারে, আর কিছুই অতটা পারে না। আর কিছুই থাকে না। পাথর আর মাটিই শুধু থাকে।** মাটি খুঁড়ে যে স্মৃতি পাথরে থাকে, মনের কথা সেই পাথরে থাকে। সেই স্মৃতি মনে থাকে, মনের মধ্যে গড়াতে থাকে। যেই স্মৃতি বাহ্যিক দৃষ্টিতে লক্ষ বছর ধরে রাখে; সেটা শুধু বাইরের গড়া থেকে দেখে না। বাইরের গড়াতে মনের গড়ার পরিচয় দেয়। মনের গড়াটা চিরকাল রাখে বলেই, মূর্ত্তি স্মরণ করিয়ে দেয় পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। পাঁচ হাজার বছর আগে কোণারক মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন। সূর্যমন্দিরে প্রস্তরে দেখবে, পাঁচ হাজার বছর আগের কথা স্মরণে ফিরে আসছে বাহ্য দৃষ্টিতে। তার মধ্যে অতি স্মরণে না থাকলে স্মরণে আসতে পারে না। ডায়মণ্ড হীরাটা, পাথরেরই জিনিস। এই কয়লা, বিভিন্ন ধাতু লোহা, সোনা সবের সূত্র পাথর। লোহা, রূপা সবের সাথে পাথরের যোগাযোগ রয়েছে। তার থেকে আমরা বেছে নিচ্ছি। লোহা, সোনা, হীরাটা বেছে নিচ্ছি। মাটিটাই তার মূল ভিত্তি।

মাটি থেকেই রূপ নিল পাহাড়, পর্বত। হিমালয় পর্বত পাথর হয়ে রইলেন। তার উপর বরফ। আবরণ দিল বরফের লেপ। পাথর বরফের আবরণে আবৃত হলো। তিনি জলে ভেজেননি। জল আটকিয়ে রাখলেন। তাঁর (হিমালয়ের) সমস্ত দেহটা যেন বরফে গড়া। তিনি বসে থেকে কি করলেন? সূর্যকে টানতে আরম্ভ করলেন। **অদ্ভুত, অদ্ভুত জিনিস তুমি খুঁজে পাবে। তুমি পাহাড়ে যাও, কাঞ্চন জঙ্ঘায় যাও, নানা রং বেরং দেখতে পাবে। এত উঁচু হয়ে রয়েছে পর্বতশৃঙ্গ, মেঘগুলি যেন বাচ্চা শিশুর মত**

খেলা করছে। নীচে সাগর চুমু খাচ্ছে। সে আছাড় খেয়ে পড়ছে। বাড়ি খাচ্ছে, ব্যথায় ফিরে আসছে। যেন বলছে, 'তোমার সাথে আমায় মিশিয়ে নাও'। মিশতে পারছে না। মিশবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। বাতাসও চায় মিশবার জন্য। কিন্তু হিমালয় পর্বত যেন ধীর স্থির সাধক ব্যক্তির মত অচল অটল হয়ে বসে আছেন। তাঁর উপর দিয়ে সব বয়ে যাচ্ছে। কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এতো কুয়াশা নয়। সবাই বলছে, 'আমায় জমাট করে নাও'। সবাই যেন জমাট বাঁধবার জন্য ব্যস্ত। এই পাহাড়টা বিরাট দেহময়। তুমি যেমন সাড়ে তিনহাত, তোমারই মতো এরও সাড়ে তিনহাত দেহ। তোমাকে যেমন আচ্ছন্ন করছে ভুল, ভ্রান্তি, সমস্যা, দ্বন্দ্ব; নানারকমভাবে জর্জরিত করছে। একেও তেমনই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সব কুয়াশায়। প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যথা পাই, ব্যথিত হই। ওর মধ্যে যা আছে, আমাদের মধ্যেও তা আছে। শরীরের মধ্যে রক্ত আসছে, সমস্ত হুঁচোট পাঁচুট খাচ্ছে। আচ্ছন্ন হয়ে আছি। এই আচ্ছন্নের রূপে একবার দিন হয়, একবার আলো হয়, আবার রাত্রি নেমে আসে।

এই যে সূর্য ডোবে, পৃথিবী ঘোরে, ১২ ঘণ্টা অন্ধকার। এর দরকার কি? এর ব্যাখ্যা কি? আমাদের রূপে কি হয়? আমাদের মধ্যে ক্ষণে দিন হয়, ক্ষণে অন্ধকার হয়। অন্ধকার আচ্ছন্ন করে। আচ্ছন্ন করে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আলোর আভাষ আছে। আমরা ক্ষণিক বুঝে থাকি, আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এই আচ্ছন্ন করে আমাদের কি ইঙ্গিত দিচ্ছে? **আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ব্যথা-বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি। এই যে বুঝ, আমরা যে বুঝতে পারছি, এটা আলোরই প্রকাশ।** এই দৈনন্দিন ঝঞ্ঝাটের অবস্থাটা বুঝতে যে পারছো, আলোতে প্রকাশ আছে বলেই, এই কথাটা বুঝতে পারছো। তবে এই আলোর প্রকাশের তেজটা আমাদের মধ্যে কম। আমাদের মধ্যে কম আলো কেন? কারণ আলোটা বরফের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। পাথরের গভীরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হতে পারছে না। তাই সেই আলোতে আমাদের তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু চিরযুগের সমাধান আর হচ্ছে না। আলোটা পাথরের মূলে প্রবেশ করছে না। বরফের উপর দিয়ে ঝরণার মত বয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষণিক

সমস্যার সমাধান করতে পারছি। কিন্তু গভীরভাবে সব সময়ের জন্য সমাধানে আনতে পারি না। সেজন্য কিছু গুহার পাথর ব্যবহার করা দরকার। **তোমার চিন্তাধারাটা যদি চশমার ভিতর দিয়ে পাস (pass) করিয়ে দাও, মনে হয়, দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারে।**

মনে কর, পাহাড় স্মরণ করছো। তার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছ। দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এই যে চশমা, পাথরতো, পাথর এই দৃষ্টিশক্তি (চোখ) ফিরিয়ে দিল। এতটুকু বালু হতে খুঁজে পাচ্ছে চশমার পাথর। ষ্টোন ঘসে চশমার পাথর হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পাথরের চোখ আছে। ৮০ বৎসরের দৃষ্টিকে ৩০ বৎসর করে দেয়। পাথর এমনি রাখলে সে দেখে না। আমাদেরও যে চোখ আছে, সে এমনি নিজে দেখে না। চোখের ভিতরও একটা পাথর আছে। পাথরের যখন দেখবার শক্তি আছে, ভিতরের বুঝরূপ যে চোখ, সেই চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা যদি পাথরের থাকে, তবে ঐ বুঝও, বুঝের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারে। **তোমার সামনে যদি একটা মূর্ত্তি রাখ আর জপ কর। গভীরভাবে যদি কাজ করে যাও, মূর্ত্তি কথা বলবে। একজন শিলে বাটনা বাটতো আর দিনরাত বলতো, 'আর পারি না, আর পারি না।' এরমধ্যে একদিন ছেঁচা খেয়েছে, রক্ত বেরিয়ে গেছে। চোট পেয়ে পাথরে রক্ত পড়লো ফোঁটা ফোঁটা। তারপরও চুপ করে বসে আছে। আর পাথর বলে উঠেছে, 'আর পারি না, আর পারি না।'** তারপর একদিন ওটা আপনি নড়তে শুরু করেছে। আগে আমাদের দেশে পাটা পুতায় (শিলনোড়ায়) মন্ত্র পড়লে দৌড় দিত। যে বাটনা বাটতো, সে অবাক হয়ে গেছে। আমার গলা, 'আর পারি না' এখান হতে কি করে বের হল? তখন ঐ পাথর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। বার বছর ওটাকে ঘসেছে (বাটনা বেটেছে)। দেড়টাকা, দু'টাকা দিয়ে কিনেছিল। এটার (পাথরের) ভিতর হতে সুর বেরোল রিফ্লেক্ট হয়ে। তোমার চিন্তাটাই ওর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। ওর বুঝেই 'ও' (শিল) বুঝেছে।

পাথর সে নিজে দেখে নাই। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বাধা দিত। তোমার অন্তরের বুঝশক্তি এত দ্রুতগতিতে রিফ্লেক্ট করেছিল যে,

ধর, ১০,০০০ বছর বেঁচে থাকলে যে শক্তি না হতো, সেই শক্তি আয়নাতে টেনে নিয়েছিল। তুমি আয়নার সামনে দাঁড়ালেই তোমারই চেহারা আয়নার মাধ্যমে ইঙ্গিত পেত, 'আর যেও না।' অতি সহজেই মানুষ এগুলি পেত। ফালতু জিনিস বেশীদিন টেঁকে না। পাথর solid. হাজার হাজার বছর তাই পাথরের পূজা চলেছে। পুঁথি শেষ হয়ে গেছে। **আমাদের পুঁথি জীবিত আছে, পাথরগুলো আছে বলেই। প্রস্তর জীবিত আছে বলেই ইতিহাস আছে।** দশহাজার বছরের কীর্তি নিয়ে যে স্তম্ভ (পাথরের) দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্য হতে খুঁজে পেয়েছে কত ঐতিহাসিক নিদর্শন। **সাধকরা, আর্টিষ্টরা কত সুন্দর সুন্দর জিনিস খুঁজে পেয়েছে। মহাদেব নিজে পাথরকে সামনে রেখে জপ করতেন। সেই পাথর আজও রয়েছে। সেই পাথরকে ত্রিশূলের মত করে রেখেছে। আজও তা ব্যোম ব্যোম করছে। গহ্বরে আজও রয়েছে সেই সুর, সেই গান।**

এক সাধক ঋষি বলেছিলেন, তোমাদের দেবতা পাথরের তলায় গড়াগড়ি করছে। শালগ্রাম শিলা গ্রামে গ্রামে পূজা করা হচ্ছে। এই শালগ্রাম নিয়ে এখন দাঁত ভাঙার উপক্রম হয়েছে। আমরা যদি সুন্দরভাবে রাখি পাথরকে, সে সুন্দরভাবে সাড়া দেবে। শালগ্রামের কোন রূপই নির্দিষ্ট কিছু নাই। যার যার রুচি বা জপ অনুযায়ী শালগ্রাম কোথাও মূর্ত্তিতে আসে নাই। কাজেই শালগ্রামকে গোল করে রেখেছে। সমস্ত জগৎটা গোল কি না, চিন্তা করলেই পাওয়া যায়। আবার আমাদের সত্তাটা যেন পাথরের মত না হয়ে যায়। পাথরের মত কঠিন যেন না হয়। **যে পাথর হতে অনন্ত জীব, অনন্তরূপের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই পাথর সজীব।** এই যে বালুকণা — পাথরকুঁচি। এই বালি কি মাটি? মাটি নয়, পাথরের কুঁচি। অগণিত অগণিত পাথরের কুঁচি সাগরকে জীবিত রেখেছে। তা না হলে সাগর শুকিয়ে যেত। কাজেই পাথর যদি সাগরকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই পাথরকে চিন্তা করলে কত সুবিধা হবে। তবে তোমাদের যে পাথরকে ঘরে এনে রাখতে হবে, তা নয়। আমি তোমাদের চিন্তা দিলাম, তোমরা সূর্য চিন্তা করলে, সমুদ্র চিন্তা করলে। চিন্তা সঠিকভাবে করলে ফল পাবেই। একজন পথ দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ডাকছে 'অবিনাশ, অবিনাশ' বলে। অবিনাশ গিয়ে দেখে

শিবমূর্ত্তি। এতটুকু পাথর, নড়াচড়া করে ডাকছে। বলছে, 'তোর ডাকে আমি খুশী হয়েছি।' মূর্ত্তির উপকারিতা অনেক আছে। এই যে **মহাপ্রভু গেলেন গয়াতে, পাথর হতে বিষ্ণু দর্শন করলেন। অদ্ভুত জিনিস পেলেন। জড়িয়ে ধরলেন।** সমস্ত বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করে দেখবে। এই যে রেডিওতে কথা হচ্ছে, এটা কি আজকের? বহু যুগ আগে থেকেই ছিল। সাধকরা বহুদূর থেকে কথা বলতো। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে শুনতো। আজকে রেডিওর সৃষ্টি নূতন কিছু নয়। এটা অনেক আগেও ছিল। সেই পুরানো জিনিসই ফিরে এসেছে। কত কথা ভেসে আসছে। সব সমস্যার সমাধান হয়। সুরটা যে বাঁধতে হয়। সুর সাধতে হয়। তুমি সবসময় যদি সুরে থাক, দেখবে আপনা আপনি সুর খেলতে থাকবে। সব সময় জপ করবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

যত ঝড়ই আসুক, তোমাদের ফেলে আমি যাব না

সুখচর
৬ই মার্চ, ১৯৭৬

আজ শিবরাত্রি। শিব আসছেন, যাতে মঙ্গল হয়। সমাজের মঙ্গল কামনা সবাই করে। নিজেদের মঙ্গল কামনা সবাই করে। শিব হচ্ছেন তারই প্রতীক। তিনি আপনমনে শুয়ে আছেন। তাঁর উপরে মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন। মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন কার উপরে? সেই মঙ্গলময়ের উপরে। মঙ্গল চিন্তা করলে মঙ্গল যে হয়, তাই মা তাঁর উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মা হচ্ছেন শান্তির প্রতীক, শক্তির প্রতীক। তোমরা সত্যের সাধনা করো। সত্যের পথে চলো। কর্মের পথে চলো। তোমরা কর্মী হও। তবেই শান্তি পাবে। মঙ্গল হবে। শিব সদাশিব। তিনি আজীবন সাধনা করে আসছেন। তিনি জন্মগত সিদ্ধ ছিলেন। শিশুবয়স থেকেই তিনি অষ্টসিদ্ধ ছিলেন।

এই শিব ভস্ম মাখতেন, শ্মশানে থাকতেন। এটাই তোমরা জানো। এটাই তোমরা শুনেছ। পার্বতীকে তিনি বিবাহ করেন। পার্বতী ছিলেন পর্বতের কন্যা। তিনি পর্বতের মতো উঁচু ছিলেন। সেই পার্বতী তাঁকে (শিবকে) সাধনা করে বররূপে পেয়েছেন। সেই ভগবতীর পূজা আমরা অতি সমারোহে করে থাকি। তিনি দশভুজা। দশহাতে তিনি দশদিকে শান্তির কামনা করেছিলেন।

তোমরা শক্তির পূজারী, বেদের পূজারী। তোমরা বেদের চর্চা করবে। কিভাবে তাঁরা সমাজকে রক্ষা করেছেন, সব জানতে পারবে।

এই শিবকে সবাই অবহেলা করতো, অবজ্ঞা করতো। পার্বতীর বোনেরা তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। পার্বতীর বাপের বাড়ী থেকে শিবকে যা খুশী তাই বলতো। কিন্তু তারা আজ নেই। দেবের দেব মহাদেব আজও সবার পূজা পেয়ে আসছেন। তাই তাঁর জন্মদিনে তাঁকেই স্মরণ করি। তিনি কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন না আছেন, অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু তিনি বলেছেন, ''আমি পাথরের ভিতর নিজেকে সঁপে দিয়ে রয়েছি। আমি পাথর। আমায় খুঁজলে আমাকে পাবে।'' তাই পাষাণ হয়ে তিনি পূজা পাচ্ছেন। সেই পাথরের ভিতরে যে তিনি আছেন, সেই সাড়া বহু ব্যক্তিকে দিয়েছেন। বহু ব্যক্তি, বহু সাধক এই বিষয়ে অবগত আছেন।

যাইহোক, এইসব কথার মাঝে ভাবের কথা, কল্পনার কথা আছে কিছু। আমরা ভাব বা কল্পনাতে না গিয়ে যদি বাস্তবক্ষেত্রে আসি, তবে শিবকে দেখি, **আমাদের পৃথিবীরই লোক তিনি। এখানে থেকেই তিনি সাধনা করেছেন এবং সমাজকে রক্ষা করার জন্য বেদের চর্চা করেছেন, বেদের প্রচার করেছেন। তিনি বেদপাঠ করেছেন। বেদের মাধ্যমে তিনি সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। বেদপাঠ করার চেয়েও তিনি প্রকৃতির বেদকে ভাল করে জানতে চেয়েছেন।** এই বিশ্বের বেদ, জগতের বেদ, যা জানলে সব জানা যায়, সেই বেদকেই তিনি ভালভাবে জেনেছেন। তাই তিনি দ্বারে দ্বারে এই প্রচার কার্য চালিয়েছেন। তাঁর (শিবের) হাতে ছিল একটিমাত্র অস্ত্র। সেটি হল ত্রিশূল। এই ত্রিশূল কথা বলতো। এই ত্রিশূলকে অস্ত্র করেই তিনি সব কাজ করতেন। এই ত্রিশূল সব কিছু করতো। এই ত্রিশূলকে যদি বলতেন, ''যা তুই জয় করে আয়'', ত্রিশূল তাই করতো। ত্রিশূলকে যা বলতেন, ত্রিশূল তাই করতো। তাঁর হাতে ত্রিশূল এইরকম ছিল।

এখনকার ত্রিশূল কথা বলে না কেন? কথা শোনে না কেন? আমরাই শুনি না আমাদের কথা। তাই ত্রিশূলও আমাদের কথা শোনে না। **আমরা যা কিছু করি বিবেকের বাইরে, চেতনার বাইরে, চৈতন্যের বাইরে। আমরা সমাজে যা কিছু করছি, নিজেদের বিবেকের বাইরেই**

বেশীরভাগ কাজ করছি। তাই বিবেকের বাইরে যে কাজ করি, সেটা অপরাধমূলক। সেইজন্যই আমরা আমাদের কথা শুনি না, বিবেকের কথা শুনি না। আর আমাদের কথা ত্রিশূল শোনে না। তিনি (শিব) ছিলেন বিবেকের উপর নির্ভরশীল। তিনি প্রকৃতির বিবেককে এড়িয়ে যেতেন না। বিবেকের উপর নির্ভর করে তিনি সবসময় চলতেন বলেই ত্রিশূল তাঁর কথা শুনতো। আমরা যদি ত্রিশূলকে আমাদের কথা শুনাতে চাই, আমরা যদি চাই যে ত্রিশূল আমাদের কথা শুনবে, তাহলে আমাদের বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে চলার অভ্যাস করতে হবে। তাতে অনেক সময় চলে যাবে। ত্রিশূলকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এই অবস্থায় আমাদের কি করণীয়? সেইজন্যই দেওয়া হ'ল মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। এই যে গীত, এই যে গান, এই যে বেদবাণী, বেদের সুর তোমরা করছো, এর মাধ্যমে তোমরা খুঁজে পাবে সবকিছু। ত্রিশূল ঠিকই তোমাদের কথা শুনবে। তোমাদের মতো তোমাদের কথার জবাব ঠিকই দেবে। তোমাদের মঙ্গলই করবে।

তাই শিবের কাছে প্রার্থনা জানাও, **"হে শিব, হে দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি যেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দেবতা হয়েছ, ভগবান হয়েছ, পূর্ণ হয়েছ; আমাদের ভিতর দিয়ে সেই পূর্ণের বিকাশ করো। তুমি পূর্ণ বিকশিত হও তোমার ত্রিশূলের মাধ্যমে।"**

তাই তোমরা যে ত্রিশূল ঘরে ঘরে বসিয়েছ, যে ত্রিশূল হাতে করে নিয়ে যাচ্ছ, এ ত্রিশূল তোমাদের কথা শুনবে। এ ত্রিশূল তোমাদের শান্তির পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কিভাবে আসবে, কেমন করে আসবে, সেটা সমূহ না বুঝলেও, ত্রিশূল বুঝিয়ে দেবে সবকিছু। বাকী সবটুকুন বুঝিয়ে দেবে। তাই আমাদের এখন একমাত্র কাজ হলো রাম নারায়ণ রাম কীর্তন করা, ঘরে ঘরে কীর্তন করা। তোমরা শাখা-প্রশাখা বাড়িয়ে তোল চারিদিকে। আর প্রত্যেকে প্রত্যেক ভাইবোনের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করবে। হিংসা-দ্বেষ যা কিছু আছে বর্জন করে, ভালবাসার মাধ্যমে তোমরা গড়েছ তোমাদের সেই সন্তানদল।

এই সন্তানদল কোন রাজনীতির দল নয়। এটা বহুবছর আগে থেকেই তোমরা জানো। কিন্তু অনেকে আমাদের ভুল বুঝে আসছে। সন্তানদলের ভিতরে যদি কেউ অন্যায় অপরাধ করে, তারজন্য সে নিজে দায়ী। সেইজন্য সন্তানদল বা আমাকে দায়ী করা চলবে না। সন্তানদল স্বচ্ছ, পবিত্র। সেই পবিত্রতা থেকে সে এগিয়ে এসেছে। সেইভাবেই সে কাজ করে যাবে।

তোমরা দলাদলি ভুলে যাও। নিজেদের ভিতরে নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করে, একত্রিত হয়ে, তোমরা সবাই কাজ করে যাও। আর রাম নারায়ণ রাম কীর্তন করে যাও। তোমাদের আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। অল্প পরিশ্রমেই তোমরা বেশী লাভের ফল পেয়ে যাবে। এই হ'ল এক কথা, মনে রেখো।

শিবের আমলে সমাজ ছিল স্বচ্ছ সুন্দর। তখন বেদাভ্যাস হতো, বেদের চর্চা হতো এবং বেদজ্ঞরা তাদের ধর্ম প্রচার করার জন্য সবাই এগিয়ে যেত। বেদজ্ঞরা তখন ধ্বনির মাধ্যমে বেদ প্রচার করতো। শব্দধ্বনির মাধ্যমে জায়গায় জায়গায় তারা বেদধ্বনি দিত। তার মাধ্যমেই তাদের মনের কথাগুলো জানিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যেত। ধ্বনিগুলোর অর্থ কেউ জানতো না। কিন্তু ধ্বনিগুলোর উপকারিতা ছিল যে, শুনলে কাজ হবে। কি কাজ হবে? সেটা জানা নাই। কিন্তু কাজ হয়ে যেত। সেটা ওরা বুঝতে পারতো। এই সময়ে এই সমস্ত বলা নিষেধ আছে। সময়োপযোগী যেটুকুনু বলা দরকার, সেইটুকুনু শুধু বলবো।

আমি রাজনীতির কথা বলি নাই কোনদিন, বলবো না। তবে অনেক সময় বলতে গেলে রাজনীতির মত লাগে। এখন বলবো straight কথা। শিব যখন সাধনা করতেন, বেদের সাধনা করতেন, তখন শিবের ভিতরে ভিতরে সেই সত্য সুরের মতন খেলতো। তিনি শ্মশানে বসতেন, নিরালায় বসতেন। যেখানে মানুষ গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে না পারে, সেইসব জায়গায় তিনি বসতেন। পার্বতীকে শোনাতেন সেই বেদের কথা। বেদজ্ঞরা চারিদিকে বেদের সুরের মাধ্যমে সমাজকে

সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইতো। কোন পরিশ্রম আর করতে হতো না। মারামারি কাটাকাটি কিচ্ছু করতে হতে না। ওগুলো যেন মুখে মুখেই থাকতো। কিন্তু কার্যে পরিণত করতে হতো না। বেদজ্ঞরা, যাদের বেদের ওপরে দখল আছে, তারা সবাই বেশ একত্রিত হয়ে বসতো। তারপর রাস্তায় রাস্তয় তারা বার হয়ে যেত, আর বেদের সুর দিত।

আমি তো সুরটা ভাল জানি না। আচ্ছা বলছি, বেদমন্ত্র...। **মহাদেব বেদ বলছেন, এই সুরটা যাদের কানে যাবে, তারা বুঝুক বা না বুঝুক, পবিত্র হয়ে যাবে। এটা বেদবাণী— বেদের যে আসল তত্ত্ব, আসল সুরের বাণী, যে বাণীতে, যে সুরেতে তারা দেবতা হয়েছেন, ভগবান হয়েছেন, পূর্ণ হয়েছেন, অবতার হয়েছেন, মহান হয়েছেন, সেই বাণীগুলো তারা সমাজে বিলিয়েছেন।** হাজার হাজার লোক সেই ধ্বনি শুনতো। ধ্বনি শুনে তারা আবার অভ্যাস করতো। সেই ধ্বনিতে মাত্র কয়েকটি কথা বলে যাচ্ছি। মূলাধার হতে সহস্রারে যে সুর আছে এই দেহযন্ত্রে, সেই সুর নিয়ে সেই বাজনা তারা বাজাতো দেহযন্ত্রের প্রতিটি চক্রে— মূলাধার হতে সহস্রারে। তারা কিভাবে যে প্রতিটি চক্রের ব্যাখ্যা করতো ধ্বনির মাধ্যমে। মূলাধারে কি আছে, স্বাধিষ্ঠানে কি আছে, মণিপুরে কি আছে, অনাহতে কি আছে, বিশুদ্ধে কি আছে, আজ্ঞাচক্রে কি আছে, সহস্রারে কি আছে— প্রত্যেকটি স্থানে একেকরকম ব্যাখ্যা। সেই ব্যাখ্যামতন যদি কেউ চলে বা ভাবে, তাতেই কাজ হয়ে যায়।

সেইসময়ে বেদজ্ঞরা দেহযন্ত্রের মূলাধার হতে সহস্রারের বর্ণনা করতো সমাজকে দাঁড়া করাবার জন্য, আত্মোন্নতি বা আত্মার মুক্তির জন্য। আত্মাকে কিভাবে পরিশুদ্ধ করতে হয়, দেহমনকে কিভাবে শোধন করতে হয়, সেই বাণী কয়েকজন বেদজ্ঞ বসে বসে লিখতো। আর মাঝে মাঝে বেরিয়ে গিয়ে সবাইকে জানাতো। শিব নিজে বসে আছেন। বসে বসে তিনি মূলাধারের বর্ণনা করছেন। বেদমন্ত্র .....। সেটাই হচ্ছে মূলাধারের বর্ণনা— সবাই শোন। চোখ বুঁজে মন দিয়ে শোন। বুঝতে পারবে না। আমি শব্দগুলি বলে যাচ্ছি। তোমরা মন দিয়ে শোন। চোখ বুঁজে মহাকাশে বিচরণ করো মনে মনে। আমি বলে যাব। তোমরা চোখ

বুঁজে মহাকাশে বিচরণ করছো। শিব যেটা করতেন। তোমরা গভীর চিত্তে চিন্তা করো। কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে তিনি প্রকৃতিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বেদমন্ত্র...। মূলাধারের বর্ণনা চলছে। মূলাধারের ভিতরে মূলবীজগুলো ফুটতে শুরু করেছে। তিনি (শিব) সেই বর্ণনা করছেন, বেদমন্ত্র...। মূলাধার থেকে বীজ ফুটিয়ে তখন সেই সর্প (কুলকুণ্ডলিনী) ক্রমশঃ ক্রমশঃ মাথা উঁচিয়ে ফণা বিস্তার করতে করতে স্বাধিষ্ঠানে গেছেন। সেখানে গিয়ে কি করলেন? এইখানে বীর্য তৈরী হয়। এইখানে সন্তান উৎপত্তি হয়। সন্তান উৎপত্তি হয় যেখানে, সেইস্থান স্বাধিষ্ঠান। সেই স্বাধিষ্ঠানে এসে শিব কি বললেন? বেদমন্ত্র...। এতটুকুনু কামবীজ, **এতটুকুনু বীর্যপাতে যেই আনন্দ উপভোগ করছো তোমরা, তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, কোটি কোটি গুণ মহা আনন্দের, মহা তৃপ্তির স্বাদ পাবে সেই সহস্রারে। এতটুকুনু স্বাধিষ্ঠানের এক ফোঁটা বীর্যপাতের আনন্দে তোমরা আত্মহারা হয়ে সমাজকে বিষাক্ত করছো। সমাজে নিজেদের ভিতরে মারামারি, কাটাকাটি, ভুল বুঝাবুঝি করছো, সেই এক ফোঁটা বীর্যপাতের জন্য।** মহাসাগরে এত বারি, এত জল। তার মাঝে এক বিন্দু জলের ফোঁটা মাত্র। তার আনন্দেই তোমরা আত্মহারা। সেখানে সন্দেহ, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, ঝগড়া, বিবাদ ও নানারকম ছল বল কৌশলের দ্বারা সমাজকে নষ্ট করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করছো না। সেই হ'ল স্বাধিষ্ঠান। সেইখানে বসে শিব বললেন, ''হে জীবলোক, হে বিশ্বের সুর, হে জীবজগৎ, (বেদমন্ত্র...) এই স্বাধিষ্ঠানে দেহবীণাযন্ত্রে সুরের খেলা চলেছে।'' মেঘের মতন চলছে। ঢেউয়ের মতো আসছে, যাচ্ছে। বাতাসে যেমন একটা সুর, একটা নিনাদ বহন করে নিয়ে যায়, সেই নিনাদের ধ্বনি বহন করছে গুরু গম্ভীর সেই মেঘের গর্জনের মতো।

শিব বললেন, বেদমন্ত্র...। স্বাধিষ্ঠান থেকে যখন মণিপুরে এল, (মণিপুরের বর্ণনা), তখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক— কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। তোমরা নাভিমূলের মাধ্যমে তোমাদের জীবন বাঁচিয়ে

রেখেছো। যখন মাতৃগর্ভে ছিলে, তখন নাভির দ্বারাই খাদ্য সংগ্রহ করে তোমরা বেঁচে ছিলে। সেই নাভিমূলের মূলগ্রন্থিতে আছে, সেই মূলাধারের মূল সুরের মহাকাশের বর্ণনা। মহাকাশ থেকে যেই রস উৎপাদন হলো, সেই রসের উৎপাদন থেকে এই মণিপুরে গিয়ে বসলো। শিব বলছেন, **তোমাদের ধর্ম শুধু নিম্নগামী; নিম্নপথেই হচ্ছে মাত্র। কিন্তু মণিপুরের গর্ভ, সেটা হচ্ছে উর্দ্ধগামী। সেই গর্ভ হচ্ছে সেই মহাকাশে, সেই মহাশূন্যে। মহাজ্যোতির আলো তোমার সম্মুখে যখন আসবে, সেই মহা গর্ভে হবে তোমার মহা সন্তান। সেই সন্তানই হবে তোমার সুর।** সেই সুরে কোন ভেজাল নেই, মারামারি নেই, কাটাকাটি নেই। সেটা হচ্ছে আকাশ পথে আকাশের সাথে তোমার মিলন। আকাশের সাথে, প্রকৃতির সাথে তুমি করবে সঙ্গম, প্রেম-ভালবাসা। তার সাথে তুমি যখন আপন সুরে মিশে যাবে; তার ভিতরে তোমার ভিতরে যখন আদান প্রদান হবে, সেখানে হবে গর্ভ সঞ্চার।

তারপর মণিপুরের মণিকোটর হতে যখন অনাহতে আসতে শুরু করলো, তখন শিবের নিজের শিহরণ হতে আরম্ভ করলো। সমস্ত শরীর কম্পমান হয়ে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের মতো দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করলো। তাঁর সমস্ত শরীর হতে, জটার ভিতর হতে আগুনের শাখা প্রশাখা বের হতে আরম্ভ করলো। তখন তাঁর সবকিছু উর্দ্ধগামী হয়ে, শিবের ভিতর হতে বিরাট আগুনের শিখা বের হতে লাগলো। শিব দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং উপলব্ধি করলেন, সেই অনন্ত বিশ্বের সুর এখানে (অনাহতে) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর কোন তুলনা মেলে না। সেটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে আকাশে বাতাসে সর্বত্র ছেয়ে গেল। বেদমন্ত্র...। তখন বেদজ্ঞরা বুঝতে পারলো, আমাদের **দেহবীণাযন্ত্রের ভিতরেই রয়েছে সুরের কেন্দ্র। আমাদের দেহের যন্ত্রেই সব সুর নিহিত আছে। এই যন্ত্র বাজাতে পারলে বিশ্বের সুর নেমে আসবে।** তখন তিনি বিশুদ্ধে গেলেন। এখানে এসে শোধন করলেন। সব সুরকে এক সুরে বাঁধলেন। বেঁধে শিব আজ্ঞাচক্রে উপনীত হলেন।

আজ্ঞাচক্রে এসে তিনি দেখতে পেলেন (বেদমন্ত্র.....) রাম

নারায়ণ রাম। আজ্ঞাচক্র থেকে আরম্ভ হয়ে গেল রাম নারায়ণ রাম (বেদমন্ত্র.....)। শিব রাম নারায়ণ রামের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন (বেদমন্ত্র...)। তারপরে এল সহস্রার। আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারের সঙ্গে যুক্ত করেই হ'ল রাম নারায়ণ রাম (বেদমন্ত্র...)। তোমরা এই রাম নারায়ণ রামের ব্যাখ্যাটা মন দিয়ে শুনবে। **তোমরা যে 'রাম নারায়ণ রাম' করছো, কতগুলো শব্দ, কতগুলো ধ্বনি; অনন্ত অগণিত অণুপরমাণুর মিলন হয়েছে এই বেদবাণীতে। মহাকাশের মহান তত্ত্বের সমষ্টির থেকে সুর সংগ্রহ করে যে তত্ত্ব, তারই রস, তারই নিংড়ানো রস হচ্ছে এই রাম নারায়ণ রাম।** তাই তোমরা অনর্গল যে রাম নারায়ণ রাম করে যাচ্ছ, এই রাম নারায়ণ রাম চির জাগ্রত। তোমরা এই সুরের সাথে সুর মিলিয়ে চলবে।

আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রারে চলেছেন শিব (বেদমন্ত্র...)। তিনি বলছেন, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম। মহাদেব নিজহস্তে লিখিলেন রাম নারায়ণ রাম (বেদমন্ত্র...)। তোমরা এই মহানাম করছো। মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম এই রাম নারায়ণ রাম, স্বয়ং মহাদেবের কাছ থেকে আজ তোমাদের কাছে এসেছে। স্বয়ং শম্ভু ভোলানাথ মহাদেব তিনি নিজহস্তে লিপিবদ্ধ করিলেন এই মহানাম। মহাবাণীর মহাশক্তি যে মুক্তবাণী, এই সেই মুক্তবাণী রাম নারায়ণ রাম। তোমরা সব একত্রিত হয়ে এই মহানাম প্রচার করবে। এই গীত গাইবে। নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিচ্ছেদ কিছু আনবে না। জায়গায় জায়গায় যে যেখানে আছ, সর্বত্র তোমরা শাখায় প্রশাখায় ভরে যাবে।

বাধা-বিঘ্ন, ঝড় ঝাপ্‌টা, নিন্দা-চর্চা, অপবাদ যত আসবে, তখন মনে করবে, তোমাদের কাজ সফল হচ্ছে। নিন্দা-চর্চা, আঘাত প্রতিঘাত যদি না আসে, সেটাই হল fall. সেটাই হ'ল শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তাই বাধা আসতে দাও। অপবাদ তোমরা শোন। তোমরা অপবাদের সম্মুখীন হবে, বাধার সম্মুখীন হবে। ঝড়ের মাঝে গিয়ে তোমরা ঝড়ের সাথে লড়াই করবে। তাই আজকে তোমরা এটাই পাবে— শিবের হাতের ত্রিশূল আর মহাকাশের নিংড়ানো রস, রাম

নারায়ণ রাম। তোমরা নিজেরা ভাই ভাইরা একত্রিত হয়ে থাকবে। তবে অনুভূতি দর্শনের আকাঙ্খা করতে যেয়ো না। কর্মই তোমাদের ধর্ম। সেভাবেই তোমরা চলবে। তাই আজ আর কিছু না বলাই ভাল।

এই কয়েকদিন আগে গেলাম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সোনামুখী ও আরও গ্রামে গ্রামান্তরে। সেখানে প্রায় ২৫/৩০ হাজারের উপর দীক্ষা নিয়েছে ১১ দিনে। রোজ ৩ হাজার/৪ হাজার দীক্ষা নিয়েছে। সারা দিনরাত পরিশ্রম করছি। কিন্তু পরিশ্রমের হাত হতে রেহাই পাচ্ছি না।

তোমরা আমাকে একটু গুছিয়ে নেবে। মায়াটা বেশী তো আমার; ভীষণ মায়া। মায়ার টানেই বড় ভেঙে পড়েছি। বেশী ভালবেসে ফেলেছি তোমাদের। কাজেই আমার এই অবস্থা। আমি যা করি, মায়ার টানেই করি; ভালবাসার টানেই করি। প্রাণের বিনিময়ে, অন্তরের বিনিময়ে আমি তোমাদের ভালবাসি। যে কাজ নিয়ে এসেছি, যা নিয়ে এসেছি, যেইভাবে এসেছি, যেখান থেকে এসেছি, তোমরা কি সেইখানে যেতে চাও? সেখানে পৌঁছাতে চাও তো? যাতে চিরযুগ আমরা একত্রে থাকতে পারি, সেটা চাও না?

ভক্তগণ — আজ্ঞে হ্যাঁ। চাই।

ঠাকুর — তাহলে তোমাদের সাথে আমার এই কথাই রইল। আমি তোমাদের গ্রহণ করে রাখছি। যদিও এটা ভাববাচ্যের মতন কথা। তোমাদের কাছে আমি শিব চতুর্দশী উপলক্ষ্যে এই কথাটা জানিয়ে যাচ্ছি। একটি কথা জানাচ্ছি তোমাদের, আমি এই বয়সে ঠাকুর হইনি। এই বয়সে তোমাদের বাবা হইনি। আমি মায়ের পেট থেকে পড়েই তোমাদের বাবা হয়েছি, এটা মনে রেখো। এতো আর গল্প নয়। আমি তো আর বিলেত থেকে আসিনি। আমার পাঠশালার মাষ্টার মশায়, স্কুলের মাষ্টার মশায় ঐ শিশুবয়সেই আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছে। ৫ বছর বয়স থেকেই আমি দীক্ষা দিচ্ছি। আমার মাষ্টার মশায়কে দেখেছো না? কৃষ্ণধন সাহা, যিনি আমাকে স্কুলে পড়াতেন। অনেকে দেখেছে

তাঁকে। আজকে এসেছেন। অনেকদিন দেখেছো তাঁকে।

আমি যেখান থেকে যেইভাবে যাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর উপরে তোমাদের কাছে এসেছি, শিশুবয়স থেকে এসেছি, আমি চাই সেই জায়গায় তোমাদের নিয়ে যেতে। ৫/৭ বছর বয়সে কেউ দীক্ষা দেয়? এতো গল্প নয়। স্কুলের মাষ্টার, হেড মাষ্টার, পাঠশালার মাষ্টার, পাড়া-প্রতিবেশী, সবাই দীক্ষা নিয়েছে। গুরুজন স্থানীয় আত্মীয় স্বজনরা এসে দীক্ষা নিয়েছে আমার কাছে ঐ বাল্য বয়সেই। সুতরাং তোমাদের সাথে যে রক্তের সম্পর্ক করে নিয়েছি, এই ৬০/৭০/৮০ বছরের জন্য আমরা যেন ডোবাতে পড়ে সবাই না মরি। সেইজন্য আমি নানা বেশ ধারণ করে অনেক সময় তোমাদের এড়াবার চেষ্টা করি। আমি যে কি করবো, কি করতে চাই, সেটা তোমাদের জানিয়ে যাচ্ছি।

আমার সমস্ত সন্তান, যারা আমার আছে, তোমাদের ভাইবোনেরা যারা আছে, আমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাতে সেইজগতে, সেই লোকে— আজ্ঞাচক্রলোক হতে সহস্রারের সহস্রলোকে গিয়ে পৌঁছাতে পারি, তারই চেষ্টা করছি। আমরা সবাই সেইভাবে যেন চিরকালের সাথী হয়ে, চিরযুগের পথিক হয়ে থাকতে পারি, তার জন্যই, তোমাদের জন্যই আমি কাজ করে যাচ্ছি। এই পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা, জন্মের জ্বালা-যন্ত্রণা আর যেন তোমাদের ভোগ করতে না হয়। আমরা মুক্তপাখীর মতন যেন সর্বত্র বিরাজ করতে পারি। নিজের ইচ্ছাধীনে নিজে স্বেচ্ছায় যেন মহাকাশে বিচরণ করতে পারি। এই ইচ্ছাশক্তি তোমাদের ভিতর জাগিয়ে তুলে, সেই মহালোকের মহাশক্তির পথে তোমাদের নিয়ে গিয়ে, সেখানে যাতে বসাতে পারি, তারই চেষ্টা, তারই প্রয়াসে কাজ করে যাচ্ছি। তারজন্যই সবকিছু যাতে করতে পারি, সেটা তোমাদের দেখতে হবে। জানি, আমি তা করবোই। আমি যা বলবো, তোমরা সেইভাবে চলবে।

ভক্তগণ — বাবা, কৃপা করো। কৃপা করো। (সমস্বরে করতালি ও উলুধ্বনি।)

ঠাকুর — তোমরা সবাই যখন চাইছো, আমরা বাপ-বেটা-বেটী সবাই একত্রিত হয়ে, আবার সবাই একত্র হয়ে, সেই পরমানন্দে, সমস্ত রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনার ঊর্দ্ধে, সেই মহা আনন্দের কামনায়, সেই সাধনায় আমরা যাতে চিরতরে ডুবে থাকতে পারি; সেই শান্তির লোকে, সেই স্তরটিতে যাতে আমরা পৌঁছাতে পারি, তারই চেষ্টা করছি এবং তোমরা যাবে, এও সত্যি কথা। তোমরা তো চাও?

ভক্তগণ — হ্যাঁ। আমরা চাই, চাই।

ঠাকুর — আচ্ছা। আমরা আবার সেখানে গিয়ে নতুন সমাজ সংসার গড়ে তুলবো, কেমন? শুনতে কেমন গল্প গল্প লাগছে, না? এটা কিন্তু গল্প নয়। এটা আমার নিজের কথা। তোমাদের ভাববার কথা। আমি যে পথের পথিক, সেই পথিকের কথা। একথা সবসময় বলা হয় না। এমনি বলার নিয়ম নয়। যে কথা বুঝানো যাবে না, সেই কথা বলা নিষেধ আছে। এটা আমার নিজের কথা। একটা তিথি (শিব-চতুর্দশী) উপলক্ষ্যে নিজের কথাটা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করলাম। এটা আমার ঘরের কথা। বস্তুতঃ পক্ষে তোমাদেরই কথা।

তোমাদের কাছে আমার আর বলার কিছু নেই। আমার অন্তর দিয়েছি তোমাদের হাতে। আমার ভালবাসা দিয়েছি, স্নেহ দিয়েছি। **তোমাদের উপরে আমি নির্ভরশীল। যে নির্ভর করে তোমাদের উপর পড়ে আছি, সেই নির্ভরতার মর্যাদা তোমরা দিও। আমি যে ভার, যে দায়িত্ব তোমাদের নিয়েছি, তা পালন করার জন্য অনেকসময় তোমাদের দুঃখ দেই, ব্যথা দেই, আঘাত দেই। কেন দেই? আমার কথা বজায় রাখবার জন্য।** জানো, লক্ষ লক্ষ, কয়েক কোটি ভাইবোন তোমাদের হলো; তারা সবাই আমার সন্তান। কত ভার আমি নিয়েছি। আমি যদি লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে, চ্যুত হয়ে পড়ি, তবে যতগুলি পিছনে বেঁধে নিয়েছি, সবগুলি নিয়ে ডোবাতে গিয়ে পড়বো। সুতরাং আমার সাথে তোমাদের যদি ঝগড়া বিবাদ হয়, তোমরা আমার উপরে যদি অসন্তুষ্ট হও, রাগ করো বা অভিমান করো, তবু আমি আমার লাইন থেকে সরে

যেতে রাজী নই। কি কঠোর পরিশ্রম করে চলেছি। দেখ, ২১/২২ ঘণ্টা ধরে বসা থাকি। মাঝে মাঝে তোমাদের দর্শন দেই। সেখানে ঝিমুনি আইসা (এসে) পড়ে। এই ঝিম্, ঝিম্ নয় বাবা। ফট্ করে আমাকে বসিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আজ বছরখানেক ধরে এই নতুন রোগ দেখা দিয়েছে। কখন যে বসে পড়ি, কখন যে ঝিম্ আসে, কখন যে পড়ে যাই। ধপাস্ ধপাস্ পড়ে যাচ্ছি, আঘাত পাচ্ছি। ছেলেগুলো আমাকে ধরে ধরে রাখে। তবু আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সন্তান। তাদের নিয়ে সেই গন্তব্যস্থলে যেন পৌঁছাতে পারি, এটাই আমার আকাঙ্খা। তাই তোমাদের কাছে আমার একটি কথা, আজ তাঁর (শিবের) জন্মদিনে, জানিয়ে দিলাম। তিনি যে গুরুভার, যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, শ্মশানে মশানে থাকতেন। কেন থাকতেন? তাঁর ভক্তদের সাথে করে যেন নিয়ে যেতে পারেন। সেই কারণে কত লাঞ্ছনা, কত অপমান সহ্য করেছেন।

আমি সবার সংসারের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করে, অংশ নিয়ে নানা ঝঞ্ঝাট, আঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে চলছি। তাই অনেকসময় তোমাদের আকাঙ্খা মতো কাজ করি না। কেন করি না? একটা একটা কণা নিয়ে, বহু কণার সংমিশ্রণেই এই পৃথিবী। একটা কণা নিয়ে কিছু হয় কি না, বলতে পার না। কিন্তু অনেকগুলো কণা নিয়েই এই পৃথিবীটা। অনেক ফোঁটা ফোঁটা জল নিয়েই সাগর হয়, নদী হয়। তাই তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাঙ্খা যদি আমি পরিপূর্ণ করি, যদিও অতি ক্ষুদ্র, অতি ছোট, আমার করতে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু এইরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্খা পরিপূর্ণ করতে করতে যদি একটা বৃহতে পরিণত হয়ে যায়, তখন তো আমার আসল কাজের অসুবিধা হতে পারে। তাই যাই হোক, তোমরা আমার সাথে ঝগড়া কর, বিবাদ কর; কথা বল বা না বল; তোমাদেরই বৃহৎ স্বার্থে আমাকে কঠোর হতে হয়। এই বিশ্বের পথিক আমি। তোমরা সেই চির আনন্দের পথে যাবে, এটাই আমার স্বার্থ। যে লাইন দিয়ে আমি তোমাদের বেঁধে রেখেছি, সেই লাইনের শেষ গন্তব্যস্থলে যাতে তোমাদের নিয়ে পৌঁছিয়ে দিতে পারি, এটাই হলো

আমার কথা, আমার সাধনা। আজকের দিনে তাঁর (শিবের) জন্মদিনে এই কথাই তোমাদের খুলে বললাম।

তাই ইঞ্জিন এগিয়ে যায়, পিছনে থাকে বগ্‌গী। বগ্‌গীগুলোকে ইঞ্জিন টেনে নেয়। ইঞ্জিন যেখানে পৌঁছে, বগ্‌গীগুলোও সেখানে পৌঁছে। তাই আমি মাঝে মাঝে বধির হয়ে থাকি। তখন ভক্তরা মনে করে, 'বাবা, আমার জন্য এটা করলেন না। ওদের জন্য করলেন। আমার কথা শুনলেন না।' ঠিক তা নয়। আমি কিন্তু তোমাদের জড়িয়ে ধরে আছি। কোলে নিয়ে আছি। বুকের সাথে বুক মিলিয়ে তোমাদের রেখেছি। তোমরা সেইভাবেই থাকবে। বহুৎ পরিশ্রম আমাকে করতে হচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে বসি। **যতটুকুনু কাজ তোমাদের জন্য করতে পারি, তারই চেষ্টা করছি। সন্তান হিসাবে তোমরা আমায় সাহায্য করো, সহযোগিতা করো, যাতে আমি এই কাজগুলো সুন্দরভাবে করে যেতে পারি।**

তোমরা শিবের কাছে কামনা করো। তাঁর কাছে আশীর্বাদ চাও। তোমাদের বাবা তো আশীর্বাদ করছেনই। গঙ্গার পাড়ে বসে তোমরা শুনলে এই বাণী, বেদবাণী। যাতে তোমরা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে মিশে থাকতে পারো, আমি যাতে তোমাদের নিয়ে যেতে পারি, সেই কামনাই করো। তবে আমি ঠিক নিয়ে যাবই। যত ঝড়ই আসুক, তোমাদের ফেলে আমি যাবো না। এইটা ঠিক। (সমবেতভাবে হাততালি ও উলুধ্বনি)। (প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠে ও পরে ভক্তদের কণ্ঠে সমবেতভাবে মহানাম গান)। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম।

আস্তে আস্তে আস্তে। চতুর্দশী শেষ হতে মনে হয়, আর বেশীক্ষণ বাকী নেই। ৩টা ১৯ মিনিটে মনে হয়, ছেড়ে যাবে। আড়াইটা বাজে। তোমরা শিবের কাছে গিয়ে প্রভু মীশমনীশ... গানটা করো। শিবের কাছে কাকুতি মিনতি করো। তাঁর জন্মদিনে তাঁর কাছে এসেছো। তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করো। তোমরা তাঁর কাছে বলো, ''আমরা তোমাকে (শিবকে) খুশী করতে পারিনি। আমরা

অজ্ঞ। তুমি নিজগুণে আমাদের ক্ষমা করো।'' মনে মনে প্রার্থনা জানাও। গানটা শেষ করে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে এসো। এর মধ্যে চতুর্দশী শেষ হয়ে যাবে। আড়াইটা বেজে গেছে। আর আধঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। পুজো আরম্ভ হয়ে যাবে। এইখানে বসে বসেই জোরে জোরে গান করো। এইদিকে মুখ না দিয়ে ঐদিকে মুখ দিয়ে করো।

এখন তোমাদের বাড়ীতে অতিথি (শিব) তো এসেছেন। অতিথি সেবা করতে হবে তো। তাঁর সেবা করো, যাও। আমরা বাপ-বেটা-বেটী তো কথা বলছি। বাবাকে ভালবাসলে, জ্যাঠাকে কি ভালবাসে না? জ্যাঠাকে কি শ্রদ্ধা জানায় না? দাদুকে কি শ্রদ্ধা করে না? তাঁর সেবা করো। যাও, ওদিকে মুখ দিয়ে বসে প্রভু মীশমনীশ... জোরে জোরে গান করো। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং গুণহীনমহেশগরাভরণম্।
রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং তনুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণুশিরোধৃতপাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

শশলাঞ্ছিতরঞ্জিতসম্মুকুটং কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং মুখপদ্মপরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধুখন্ডবিমন্ডিতভালতটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং গরলাশনমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

মকরধ্বজ-মত্তমাতঙ্গহরং করিচর্মগনাগবিবোধকরম্।
বরমার্গণশূলবিষাণধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

জগদুদ্ভবপালননাশকরং ত্রিদিবেশশিরোমণিঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

অনাথং সুদিনং বিভো বিশ্বনাথো পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোহখিলদুঃখসমূহহরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

জয় শম্ভো। জয় শম্ভো। জয় শম্ভো।

জয় শম্ভো। জয় শম্ভো। জয় শম্ভো।

জয় শম্ভো। জয় শম্ভো। জয় শম্ভো।

সবাই প্রার্থনা জানাও। অন্তর থেকে প্রার্থনা জানাও। হাতজোড় করে প্রার্থনা জানাও। হে শিবশম্ভু, আমাদের করুণা কর, দয়া কর। মনের বাসনা পূরণ কর। পূরণ কর।

মনেরই বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে,
মনেরই বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে।
লাগলো হরির লুট নিতাই আনন্দবাজারে
আনন্দবাজারে নিতাই প্রেমেরই বাজারে।
প্রেমেরই বাজারে নিতাই আনন্দবাজারে।। (২)
মনেরই বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে।
লাগলো হরির লুট নিতাই আনন্দবাজারে। (২)

যার যত বাঞ্ছা মনে
ভক্তি কর সদাই মনে, হরিচরণে।
যার যত বাঞ্ছা মনে
ভক্তি কর সদাই মনে, গুরুচরণে।।
মনেরই বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে। (২)
লাগলো হরির লুট নিতাই আনন্দবাজারে
আনন্দবাজারে নিতাই প্রেমেরই বাজারে
প্রেমেরই বাজারে নিতাই আনন্দবাজারে
মনেরই বাসনা যত .....।

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) বীরেন্দ্র দর্শন, জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোল-৫, ফোন- ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, ফোন - ২৪৪০-৯১৫১
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১০) বলরাম, ৩৪ এস.কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮, মোঃ- ৯৮৩৬৬৯৯৪৪৮
১১) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১২) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৩) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৪) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৫) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৬) মধুসূদন মৈত্র পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৮৩১৬১১৬৮৪
১৭) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২১) বালক ব্রহ্মচারী যোগ মন্দির, লিলুয়া, হাওড়া, ফোন - ৯২৩০৯১৩৬৫৫
২২) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২৩) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৬) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
২৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কোচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
২৮) ভগীরথ সাহা (ভগু), গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার, মোঃ- ০৯২৩৩২৩৭৬৬৬
২৯) বিভাস চক্রবর্ত্তী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ০৯৬৪৭৭৯২৫২২
৩০) ডঃ সুধাংশু দত্ত, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ফোন - ০৯৪৩৫১৯০৭৮১
৩১) বেদধাম, ইছাপুর, উঃ ২৪-পরগণা, মোঃ- ০৯৪৩৩৯৫৯১৩৮

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪) চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫) মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬) সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭) লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮) বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯) যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫